তনচংগ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

প্রকাশনায়

চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ

রাঙামাটি সরকারি কলেজ

চাঙমা

একটি তন্‌চংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদনায়

মিলিন্দ তন্‌চংগ্যা

প্রকাশনায়

চাঙমা প্রকাশনা পর্ষদ

রাঙামাটি সরকারি কলেজ

চাঙ্গৈন

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (বিষু সংখ্যা)

পহেলা বৈশাখ ১৪২১ বাংলা, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৪ ইংরেজী

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক :

মিলিন্দ তন্চংগ্যা

সদস্য ও সদস্যা-

রাঙামাটি সরকারি কলেজের অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ-

সহযোগীতায় :

সুপ্রিয় তন্চংগ্যা

প্রভাত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

হিরো তন্চংগ্যা

শিমুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

শান্ত বাবু তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ:

তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা

ডিজাইন ও মুদ্রণে :

সীবলী অফসেট প্রেস,

কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী,

রাঙ্গামাটি। ফোন : ০৩৫১-৬১৮৮২

শুভেচ্ছা মূল্য- ৭০/- (সত্তর) টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

প্রমিতা তঞ্চঙ্গ্যা, ছাত্রী, রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজ

ও

অরুন বাবু তঞ্চঙ্গ্যা, ছাত্র, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ।

আমাদের বন্ধু, সহযাত্রী, সহযোদ্ধা ও সহকর্মী। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে
"চাঁলৈন প্রকাশনা পর্ষদ" পরিবার পক্ষ থেকে
গভীর শোকাঞ্জলী ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায়.....

সম্পাদকীয়-

একই ভূমিতে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন করতে হবে না তো?

বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। দেশকে নিয়ে সবাই কম বেশি গর্ব করে। দেশকে নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন, পেয়েছেন বিভিন্ন সম্মাননা। কিন্তু সে সম্মাননাকে কতটুকু সম্মান বা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বড় প্রশ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বহুজাতি, বহুরূপী, বহু ভাষা বহু সংস্কৃতি ভরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকার শান্তি পুরস্কারও অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবে কী পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী আদৌ শান্তির আলো দেখতে পেয়েছে? যেখানে বহুভাষা, বহু সংস্কৃতির মাতৃভূমি তা আজ অনেকাংশ বিপন্ন হতে চলেছে। হারিয়ে যেতে বসেছে সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য এবং পাহাড়ের সুগন্ধ। শুধু তা নয় আজো সিংহভাগ আদিবাসী মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা থেকে কোন না কোন ভাবে বঞ্চিত। আগ্রাসনের ফলে আজ আদিবাসীদের ভাষাও মুমূর্ষু। তাই মাঝে মধ্যে প্রশ্ন জাগে- বাংলা ভাষার জন্য যেরকম ৫২' ভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছে, তদ্রুপ আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা রক্ষার জন্য আদিবাসী ভাষা আন্দোলন জন্ম দিবে না তো? কোন নিশ্চয়তা নেই- সময়ের প্রয়োজনে জন্ম দিতেও পারে। তখন একই ভূমিতে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন জন্ম নেবে।

শুধু ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ঘটা করে পালন করলে মাতৃভাষা রক্ষা হয় না। নিজের এবং অন্যের ভাষাকে মূল্যায়ন ও রক্ষা করা বা ভাষাকে ঠিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করায় হচ্ছে আন্তরিকতার বড় পরিচয়। সকল মানুষের ভাষা রক্ষা করার ব্যবস্থা করাই হল রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব। তাই বাংলা সনের বাংলা নববর্ষে ও আদিবাসীদের বৈসুক, সাংগ্রাই, বিষু, বিঝু (বৈসাবি) উপললক্ষে সচেতন নাগরিক সমাজের কাছে একটা প্রশ্ন- এক ভূমিতে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন করতে হবে না তো?

এই সংকলনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে কবি রত্ন শ্রী কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার অপ্রকাশিত মানুষ দেবতা নামক একটি নাটক যা ধারাবাহিক ভাবে ছাপানো হবে। অপ্রকাশিত এই নাটকটির পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন কবি শ্রী কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা। তার কাছে চাঁলেন প্রকাশনা পর্ষদ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে এই সংকলন প্রকাশে যারা আমাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন ব্যক্তি বিশেষে ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ এবং আগামীতে আরো সঙ্গে পাবো এ প্রত্যাশা রাখি। আর যারা লেখা দিয়ে সংকলনকে পূর্ণতা দান করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আর দুঃখ প্রকাশ করছি যাদের লেখা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাপাতে পারিনি। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুতি গুলো ক্ষমা, সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এক্ষেত্রে গঠন মূলক উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি। বিষু উৎসব ২০১৪ খ্রিঃ সকলের জন্য বয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি এবং সকলকে বিষুর শুভেচ্ছা রইল।

সূচীপত্র

কবিতা (বাংলায়)

ছড়া

তন্‌চংগ্যা গান

জুমদেশের নারীর অনুভাবনা

- প্রফেসর মংসানু চৌধুরী

আদিবাসী নারীরা লৈঙ্গিক, জাতিগত কিংবা সাংস্কৃতিক কোন পরিচয়েই নিজেদেরকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেনা। কেবল নারী - সামাজিক এই পরিচয় তার চারপাশে একটি উঁচু প্রাচীর তুলে দিয়ে তার বঞ্চনার যাতনা ও দীর্ঘশ্বাসকে প্রলম্বিত করেছে। সংখ্যায় লঘু, অগ্রসরতায় দুর্বল জাতিসত্তার অন্তর্গত হওয়ায় ক্ষুদ্রতা ও পশ্চাদপদতার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে তাকে ক্রমাগত আরও বেশী অবহেলা ও তুচ্ছতার অসহায় শিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই পার্বত্য জনপদে নিসর্গের কোল ঘেঁষে আপন খেয়ালে ছড়ানো আদিগন্ত পাহাড়, অবারিত বনপ্রান্তর আর অস্থির পায়ে ছুটে চলা গিরিঝর্ণার মিথস্ক্রিয়া প্রতিনিয়ত যে অপরূপ চিত্রকল্প তৈরী করে চলেছে তার অনিবার্য রূপান্তর হিসেবে গিরি সংস্কৃতির যে নিখাদ সত্তা পল্লবিত হয়েছে, তা বস্তুজাগতিকতায় আধুনিক ও অগ্রসর সংখ্যাগুরুর উন্নাষিক সংস্কৃতির কুলিন সমাজের কাছে অচ্ছ্যুতই থেকে গেছে। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিকে তাই অনেকেই - তাদের মধ্যে শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবান হিসেবে অনেক দাবীদারও আছেন - আদিম চোখেই দেখে থাকেন। আদিবাসী নারী - একেতো 'নারী' তার উপর 'আদিবাসী'। তাকে যেভাবে 'দেখা' এবং 'উপস্থাপন' করা হয় তাতে কোন মর্যাদার আবরণ পরানো থাকেনা। আদিবাসী নারী - উপেক্ষিত ও অরক্ষিত, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে। উভয় ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী শোষণ, নির্যাতন আর বৈষম্যের অসহায় বলি হয়েছে যুগে যুগে। তার কারণ আদিবাসী সমাজ সব বিচারেই প্রান্তিক। প্রান্তিক অবস্থানে তাদের এনে দাঁড় করানো হয়েছে। এটা কোন স্বেচ্ছা প্রণোদিত স্থান গ্রহণ নয়। সংখ্যায় স্বল্প, শিক্ষায় পশ্চাদপদ, অর্থে বিত্তে অসচ্ছল, জীবননির্বাহী অর্থনীতির চাকায় যাদের জীবন এখনও আটকে আছে, কূটকৌশল বিবর্জিত সারল্য যেখানে এখনও অধিকাংশের জীবনের নিয়ামক, এমন একটি জনগোষ্ঠীর বিষয়ে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ে অস্বচ্ছ ও ভ্রান্ত ধারণা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্রমশঃ প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমাজের প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত অস্থিরতা আদিবাসী নারীকে আরও বেশী অসহায় ও কোণঠাসা করেছে। সামাজিক সুস্থিতি ও স্থিতিশীলতার অনুপস্থিতি তাঁদের পরম্পরাগত আরক্ষার দেয়ালে সময়ের পরিক্রমায় ক্রমশঃ ধ্বস নামিয়েছে। আদিবাসী সমাজ এমনিতেই সংখ্যাগুরু সমাজের আগ্রাসনের মুখে আতঙ্কগ্রস্ত। কারণ তাদের স্বকীয় পরিচয় ও অস্তিত্বের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় উপেক্ষার মুখে এখন রীতিমত সংকটের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। এই বাস্তবতা অরক্ষিত আদিবাসী নারীর আরক্ষার পরিমন্ডলকে নিঃসন্দেহে আরও সঙ্কুচিত করেছে।

আপাতঃ পর্যবেক্ষণে যে কারো জনের মনে হতে পারে আদিবাসী নারীরা চলাফেরায় অনেক বেশী স্বাধীন এবং তেমন কোন সামাজিক বাধানিষেধ আছে বলেও মনে হবেনা। এই ক্ষেত্রে তাঁরা সমতলবাসী নারীদের তুলনায় (বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের) এক ধাপ এগিয়ে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আদিবাসী নারীরা তাঁদের সমাজে পুরুষদের সমকক্ষ

এবং তাঁদের সমতুল্য অধিকার ভোগ করে। বরঞ্চ আদিবাসী সমাজে নারী ও নারীর জীবন গোষ্ঠী ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা আরও অন্যান্য আদিবাসী সমাজের অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীরাও গোষ্ঠীকেন্দ্রীক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুশাসন মূলে প্রতিষ্ঠিত রীতি ও রেওয়াজের কারণে মানবিক অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। পুরুষের চোখ রাঙানি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এখনও নারীর জন্য শেষ কথা। যুক্তি ও ন্যায়ের শক্তিতে নয়, বাহুবলে ও পুরুষের স্বভাবজাত উদ্ধত কর্তৃত্ববলে অধিকৃত সমাজপতির আসনটিতে বসে পুরুষজাতি অহংবোধে মদমত্ত হয়ে নারীদের জন্য সমাজের বুকে একটি লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছে। এ রেখা ডিঙানো নারীর জন্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ নারীর জন্য কিছু অলড়ঘনীয় ও পালনীয় অনুশাসন তৈরী করা হয়েছে। এসব অনুশাসনের ব্যত্যয় ঘটলে দন্ড আছে, যা নারীকে মাথা পেতে নিতে হবে। অথচ সমাজের অনুশাসন লংঘন করে পুরুষেরা অনেকক্ষেত্রেই পার পেয়ে যায়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাই যে কোন অমানবিক 'বিপর্যয়'কে আমরা নারীর জন্য অপেক্ষমান দেখতে পাই। নারীকে সমাজে পদে পদে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এ অবস্থা একদিনের নয়-বহু বছরের। অথচ মানব সভ্যতা ইতিমধ্যে তার লব্ধ জ্ঞান, যাবতীয় অর্জন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে অনেকদূর এগিয়েছে। সেই সাথে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণাও বিবর্তিত হয়েছে। সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বদলেছে। কিন্তু অধিকার-কেন্দ্রিক নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে এমনটা বোধ করি দাবী করা যাবেনা। এখানে এমন একটি পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের জীবিকা নির্মানে নারীর ভূমিকা কিংবা তার অবদান বা অংশগ্রহণ, যাই বলিনা কেন, সবচেয়ে বেশী এবং জোরালো। পারিবারিক জীবিকার নানা আয়োজনে আদিবাসী নারীকে আমরা রীতিমতো স্বয়ং দশভূজার ভূমিকায় আবিষ্কার করি। পরিবারের প্রয়োজনে একজন আদিবাসী নারী কী না করে। ভোর রাতের আলো আঁধারিতে বিছানা ছেড়ে উনুন ধরানো, আগের রাতের বাসি হাঁড়ি, বাসন-কোসন মাজা-ঘষা ও ধোয়া-মোছা করা, ঘর-উঠান ঝাড়- দেয়া, সকলের জন্য খাবার তৈরী করা, অনেক দূরের পাহাড়-জঙ্গল থেকে খুঁজে পেতে পাহাড়ী পথ বেয়ে জ্বালানী কাঠ বয়ে নিয়ে আসা, দূরের কোন পাহাড়ী ছড়া থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা, ফসলের ক্ষেতে কিংবা বহুদূরের জুমে গিয়ে হাড় ভাঙ্গা শ্রম দেয়া ইত্যাদি কোন কাজটি নেই যে আদিবাসী নারীকে করতে হয়না। পিত্রালয়ে থাকতে তাকে এসব কাজে সময় দিতে হয়। যখন স্বামীর ঘরে চলে যায় তখন এসব কাজ ছাড়াও নতুন দায়িত্বের বোঝা তার উপর চেপে বসে। সন্তান ধারণ, সন্তান লালন, শ্বশুর-শ্বাশুরীর দেখ-ভাল, স্বামীর সাথে জুমের কিংবা খেতের ফসল মাথায় করে উপর নয়। অনুরূপভাবে শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একই অনুমিতি প্রযোজ্য। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা সমূহের অধিকাংশই দারিদ্র্য পীড়িত ও প্রত্যন্ত। খুব কম সেবাই সেখানে পৌঁছাতে পারে। ফলে আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদের অধিগম্যতা থেকেও

তাঁরা বঞ্চিত। তবে একথাও সমভাবে স্বীকার্য্য যে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আদিবাসী নারীদের অধিকার অনেকাংশেই রয়েছে। প্রকাশ্য বাজারে তাঁরা পুরুষদের পাশাপাশি কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে এই ছাড় তো মরুতে বারিবিন্দুবৎ। সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ একেবারেই প্রান্তিক। আদিবাসী সমাজ কাঠামো কিংবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো কোনটাতেই আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্ব বলতে গেলে নেই। অংশ গ্রহণ তো অনেক পরের ব্যাপার। বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতা কাঠামোতে মৌজা প্রধান (হেডম্যান) ও গ্রাম প্রধান (কার্বারী) পদে পুরুষদের একচেটিয়া প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করি। এমন কি সার্কেল প্রধানদের প্রায় সকলেই পুরুষ। কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতকে ও ১৯৮০ এর দশকে যথাক্রমে চাকমা ও মং সার্কেলে ভারপ্রাপ্ত চীফ্ হিসেবে নারীকে কাজ করতে দেখা গেছে।

ইদানিং অবশ্য স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের কিছুটা অধস্তন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ১৯৯৭ সালের পর তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আদিবাসী নারীরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ নারী সদস্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। এর কারণ প্রথমতঃ, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের কী ভূমিকা হবে বা তাঁরা কী দায়িত্ব পালন করবেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে তার কোন নির্দেশিকা না থাকা। দ্বিতীয়তঃ, পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নারী সদস্যদের বক্তব্য শুনতে আগ্রহী না থাকা। তিনি কেবল প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের (নারী সদস্য) দস্তখত নিতে আগ্রহী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১২ সদস্যের মধ্যে ৩ জন নারী (সংরক্ষিত) ও পৌরসভায় ১২ থেকে ১৫ সদস্যের মধ্যে ৩ থেকে ৫ জন নারী (সংরক্ষিত)। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে ২২টি আসনের মধ্যে ৩টি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটিতে ৩৪ আসনের মধ্যে ৩টি আসন নারী প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত। উভয় পরিষদের ক্ষেত্রে ২টি করে আসন আদিবাসী নারীদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনের বাইরে সাধারণ আসনে কোন নারীকে মনোনয়ন দেয়া হয় নি। অনুরূপভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মনোনীত সদস্যদের মধ্যে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ১ জন মাত্র নারী সদস্য রয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজ একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। এ সময়ে এখানকার আদিবাসী তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিচয় সংকটের অতল খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্বিনীত সময় যেন আদিবাসী অস্তিত্বের শিকড়সহ উপড়ে নিয়ে গিয়ে ভয়াল কৃষ্ণ গহ্বরের মুখে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। আদিবাসী ভাবনা ও জীবন ব্যবস্থা সম্বলিত একটি শাসন কাঠামো নির্মাণের অলংঘনীয় অধিকার পূরণের আকাঙ্খাকে থামিয়ে দিতে চাইছে। উঠে দাঁড়ানোর সমস্ত আয়োজন ও পথকে একে একে রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই অস্থির এ ক্রান্তিকালে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি টালমাটাল হয়ে উঠে। সুযোগ বুঝে ওৎ পেতে থাকা জিঘাংসা, সহিংসতা, সংঘাত তার হিংস্র থাবা বসিয়ে দেয় সমাজের বুকে। ফলে অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবন বিপর্যস্ত হয়, সম্প্রীতির কৃত্রিম দেয়াল ধ্বসে পড়ে, আর শান্তি হয় নির্বাসিত।

সহিংসতা কবলিত অঞ্চলের সবচেয়ে অসহায় বলি হলো নারী, শিশু, পঙ্গু ও বৃদ্ধ। পার্বত্য চুক্তি হয়েছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সহিংসতামুক্ত হয়নি। এখনও সহিংসতার পদচারনায় আমরা শিহরিত হই। আশি ও নব্বই-এর দশকের ভয়াল দিনগুলোর কথা আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। আমরা দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা চলাকালে কিভাবে আদিবাসী নারীর সম্ভ্রম, আব্রু পশুরূপী মানুষদের ছিনিমিনি খেলার সহজ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সম্ভ্রম লুটে প্রাণ সংহার করা হয়েছে বহু নারীর। অপহৃত হয়েছেন অনেকেই যার খোঁজ পাওয়া যায় নি অদ্যাবধি। এসব ঘটনার অনুবৃত্তি বা পুনরাবৃত্তি কোনটাই সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য শুভ নয়। এতে মানবিকতা বারে বারে বিপর্যস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। নিজের সম্ভ্রম রক্ষা নারীর অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। সমাজের ও রাষ্ট্রের অভিভাবক সেই অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীকে তার মর্যাদা নিয়ে যদি সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তাহলে পার্বত্য লোকালয়ে মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার কোন বিকল্প নেই। মানবাধিকার চর্চার ও রক্ষার পথ তখনই অবারিত হয় যখন দেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা অজুহাতে সংঘটিত আপতিত ও বিক্ষিপ্ত সহিংসতা এবং তার অনিবার্য পরিণতিতে আদিবাসী নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদাহানি ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকারের নাজুক পরিস্থিতির দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে এবং সেই সঙ্গে এ বিষয়টিও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, গণতান্ত্রিকতার চর্চা এ অঞ্চলে অনেকখানি অনুপস্থিত। এতে নারীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা বাড়বে বৈ কমবে না। এ বঞ্চনা আদিবাসী নারীর ক্ষেত্রে আরও বেশী ব্যাপক ও গভীর। কারণ প্রথমতঃ, সে নারী। দ্বিতীয়তঃ, সে আদিবাসী। নারী হিসেবে একেতো সে অরক্ষিত, অন্যদিকে আদিবাসী হিসেবে সে আরও বেশী অরক্ষিত।

উত্তরাধিকার আইন, সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রীতিপ্রথা ও রাজনৈতিক অধিকার প্রশ্নে নারীর দুর্বল অবস্থানের প্রেক্ষিতে আদিবাসী নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরী হয়েছে। ফলে আদিবাসী নারী নিজেকে পুরুষের অধস্তন মনে করে। এ মানসিকতা থেকে নারী নিজেকে দুর্বল ভাবতে শিখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীর এহেন অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য কতিপয় পরামর্শের ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারেঃ

১. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো পার্বত্য চুক্তির আন্তরিক ও পূর্ণ বাস্তবায়ন;
২. স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে আদিবাসী নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৩. পিতৃ সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
৪. নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
৫. আদিবাসী নারীর প্রতি সকল রকমের সহিংসতা রোধে প্রশাসন কর্তৃক সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ;
৬. উন্নয়ন কর্মকান্ডে আদিবাসী নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
৭. আদিবাসী পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকা।

লেখক ঃ আদিবাসী গবেষক

বিঝু

- কে ভি দেবাশীষ চাকমা

চৈত্র মাস। গাছের কচি পাতা বসন্তের মৃদু হাওয়ায় দুলছে। বিঝু ফুল সাদা করে ফুটছে। চৈত্র মাসও প্রায় শেষ। গাছের ডালে পড়ে, কচি পাতার আড়ালে কালো কোকিলটি বার বার আপন মনে ডাকছে মধুর সুরে। আমাদের গ্রামটি এমনিতে গাছ-গাছালির ভরপুর। বসন্ত এলে গ্রামের চারিদিকে শোনা যায় কোকিলের মন মাতানোর মধুর ডাক। আমাদের বাড়ির উঠোনে একটি নাকেশ্বর গাছও আছে। প্রতি বছর এ সময়ে অনেক ফুল ফোটে। ফুলের গন্ধও মিষ্টি। ফুলগুলো দেখতেও খুব সুন্দর, দূর থেকে সাদা করে দেখা যায়। ভোরে আমার ঘুম ভাঙার পর শুনি ভ্রমরার গুনগুনি। গাছের কাছে গিয়ে দেখি, অনেক প্রজাপতি এসেছে। গাছের চারিদিকে ডানা মেলে উড়ছে। মাঝে মাঝে বিছানায় শুয়ে শুনি, কোকিলটি ডাকছে, নাকেশ্বর গাছের ডালে পড়ে। উঠোনে আরেকটি ফুল গাছ আছে। নাম রক্তজবা। ফুলগুলো প্রতিদিন সকালে ফোটে দুপুরের পর আস্তে আস্তে মলিন হয়ে যায়। আর নয়ন তারা ফুলগুলোও আছে। আমের মুকুল ঝরে গেছে। আমগুলো বড় হচ্ছে। কাঠাল গাছে কাঠাল ধরেছে।

আমাদের বাড়ি উঠোনে একটি বড় আম গাছ আছে। আমরা বিশেষ করে গ্রামের গৃহবধূরা এ সময়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। আমরা সবাই আম গাছের বড় বড় শিখোরে বসে গল্প করি। বিঝুর কাছা-কাছি হলেও তো বলাই যায় না। কে কি বলে! বিঝু দিনে কি কি আয়োজন করবে, কে কোথায় বেড়াতে যাবে। কে কোন পিনোন-খাদি পরবে। কোথায় কোথায় তরকারি খুঁজতে যাবে। কার কার বাড়িতে বেড়াতে যাবে। কে কার সঙ্গে যাবে। মাঝে মাঝে অতীত প্রেমের কথাও আসে। কত যে হাসি, ঠাট্টা করা হয়! কত কি আলোচনা হয়! আর আমের সালাত (খোরবো) থাকলেও তো কথাই থাকে না। নাপ্পি, রসুন আর মরিচ মেশানো আমের সালাত দেখলে জিহ্বে জল ঝরে। কথা বলতে বলতে আমের সালাত খেতে খেতে কখন যে শেষ হয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না। এ বছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমগুলো ঠিকমতো বড় হতে পারছে না। আগের মতো আমরা আজ আরো কয়েকজন একত্রিত হয়েছি। বিঝু নিয়ে আলোচনা করছি। জীবনে অনেক বিঝু এলো-গেলো। এক একটি বিঝুর এক একটি অনুভূতি। অন্যরকম আনন্দ।

পরান্যে মা বলল, বিঝু আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। এ বছর এখনও বৃষ্টি হলো না। প্রতি বছর এ সময় গাছে গাছে আম দেখা যায়।

চিপতি মা বলল, কই আর বৃষ্টি হল! সকালে একটু একটু কুয়াশা পড়ে। যথেষ্ট শীতও করে।

আমি বললাম, প্রতি বছর ফাল্গুন মাস এলে বামুন্যে লেপ কেনার জন্য গরু বেচার পর শীত থাকে না। এ বছর তার গরু বেচা, লেপ কেনার সার্থক হয়েছে। চৈত্র মাস শেষ হয়েও শীত চলে গেল না। চৈত্র মাস শেষেও শীতের রাজত্ব থাকা আমার জীবনে এ প্রথম দেখলাম।

নাগরি মা রসিকতা মেয়ে। সে আমাকে লক্ষ করে বলল, নিমোনের মা, শীত যায়নি ভালোই হয়েছে।
চিপতি মা হেসে হেসে বলল, ওমা, তোর তো দেখছি এখনও শীতের কদর কাটেনি। বাব্বা, এ বয়সে আবার শীত!
ফদাঙে মা বলল, ও তো চির সবুজ।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, চির সবুজ মানে?
পরান্যে মা বলল, চির সবুজ মানে বুঝছিস না নিমোনের মা! চির সবুজ মানে হচ্ছে, প্রেমের পূজারী। বুঝলি?
ও, বুঝেছি।
থুবথুব্যে মা সে লাজুক মেয়ে। কথাও কম বলে। কথা কম বললেও বিয়ের অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের আর্শীবাদের অনুষ্ঠান কোনোটি বাদ দেয় না। সঙ্গীদের সঙ্গ দেয়। সে কথা বলে ভেবে-চিন্তে ঠিক করে। থুবথুব্যে মা বলল, নাগরি মা'র বোধহয় এখনও কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে ইচ্ছে করে।
থুবথুব্যে মা এ কথা বলে সবাই হু হু করে এক সাথে হাসলাম। ওর কথায় কত কি বলে হাসছি! হাসারও কোনো ভয় নেই। আজ আমার শ্বাশড় বাড়িতে নেই। শ্বাশুড়ি মা আমার মেয়েকে নিয়ে অন্য বাড়িতে বেড়াতে গেছে। যুবতী মেয়েও নেই। আমরা সবাই গৃহবধু। সকলে একধাবের মেয়ে। আমাদের মনের কথা খোলাখুলি বলতে কোনো সুবিধা নেই। আমাদের হাসি যখন থামল, তখন আম গাছের কিছু পাকা পাতা ঝরে পড়ল। সাথে ছোট্ট একটি আমও ঝরে পড়ল। ঝরে পড়ার আমটি আমাদের জানিয়ে দিল বিঝু আর বেশি দেরি নেই।
আমি বললাম, বিঝু বেশি দেরী নেই। এ বছর কার কেমন আয়োজন হবে তাও জিজ্ঞেস করলাম।
থুবথুব্যে মা বলল, নিমোনের মা, গত বছর তোদের বাড়িটা না খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিস। ফুলের গন্ধও বেশ মিষ্টি ছিল।
ওতো সাজিয়েছে আমার ছেলে নিমোন। আমাদের তো ফুলের কোনো অভাব নেই। উঠোনে আছে একটি নাকেশ্বর গাছ। তাছাড়া আমি সাদাকে খুব ভালোবাসি।
পরান্যে মা বলল, পাজন তরকারিও খুব মজা হয়েছে।
আমি বললাম, তোদের নিয়ে আর পারা যায় না। তোরা শুধু আমাকে প্রশংসা করছিস। তোদের বাড়িতেও কি কম হয়েছে নাকি?
চিপতি মা বলল, আমার চিপতির বাবা তো সব সময় বলে, তোর রান্না নাকি সব সময় ভালো হয়। প্রতি বছর বিঝুর পাজন তরকারি খাওয়ার অপেক্ষায় থাকে।
নাগরির মা সেসব কথা না বলে বলল, বিঝু এলে এক ঝামেলা।
আমি বললাম, কিসের ঝামেলা! বিঝু তো আনন্দই।
নাগরির মা আবার বলল, কই আনন্দ! কাপড় কাজাতে হয়। ঘর-দোর মুছাতে হয়।
পরান্যে মা বলল, এসবি মধ্যে তো আনন্দ।

আমি বললাম, বিঝু এলে বাড়ির বাইরে থাকা সদস্যরা সকলে বাড়িতে ফিরে আসে। নতুন নতুন পিনোন-খাদি পরতে ভালো লাগে। বাড়ির প্রধান খাম্বায়, সাকোয়, নদীর দেবতাকে, গোয়াল ঘরে, মুরগি ঘরে সকাল সন্ধ্যা মোম বার্তি জ্বালানো। খুব ভোরে উঠে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ছেড়ে দেওয়া। হাঁস-মুরগিদের খাবার দেওয়া। বুড়ো-বুড়িদের গোসল করানো। তাদের কাছ থেকে আর্শীবাদ নেওয়া। খুব ভোরে উঠে বিঝুগুলো খাওয়ানো বলে বাচ্চাদের নদীতের গোসল করানো। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির হাঁস-মুরগিদের খাবার দেওয়া-এসবি করা তো অন্যরকম আনন্দ। আমার কথা শুনে নাগরির মা একটু লজ্জা পেল।

ফদাঙে মা বলল, আমার পিনোন তো বুনা শেষ করতে পারলাম না। খাদিটা কোনোমতে করেছি।

থুবথুব্যে মা বলল, আমার কিন্তু বিঝু দিনে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের খাবার দিতে খুব ভালো লাগে। তারা দল বেঁধে বেড়ায়। তাদের মনে কোনো পাপ থাকে না। নির্মল চিত্তে শুধু আনন্দ নিয়েই সারা গ্রাম এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

চিপতি মা বলল, আমার ভালো লাগে মদদিদের পরিবেশন করতে। তোর থুবথুব্যের বাপ এক কাপ খেলেই কোমর দুলানো শুরু করে দেয়। ও খুব ভালোভাবে নাচতে পারে।

পরান্যে মা বলল, মদ খেলে এত কথা, নাচ কোথেকে আসে, আমি বুঝতে পারি না। মদ খেলে বোধহয় লজ্জা-চরম একুটও থাকে না।

আমি বললাম, আসলে তো। আচ্ছা তোরা বলতো, পাজন তরকারি রান্না করতে শাক-সব্জি, ফল-মুল লাগবে। এগুলো কিভাবে যোগাড় করবি।

নাগরির মা বলল, সবাই বলে, সাত ঘরের পাজন তরকারি খেলে নাকি শরীরে রোগ-ব্যাধি থাকে না।

ফদাঙে মা বলল, পাজন তরকারি আরো বেশি নাকি ভালো হয়, একশত বিশ প্রকার শাক-সব্জি, ফল-মুল দিয়ে রান্না করলে।

পরান্যে মা বলল, বিঝু দিনে একশ বিশ বাড়িতে পাজন তরকারি খেলে নাকি আরো বেশি ভালো হয়। শরীরে কোনো রোগ থাকে না।

আমি বললাম, এতো প্রকার শাক-সব্জি, ফল-মুল। সেসবে নিশ্চয় কোনো না কোনো ওষুধির গুণ থাকবে। ও হ্যাঁ, ফুল বিঝু দিনে আমি এখনও পানিতে ফুল ভাসায়। এ বছর গ্রামের সব বধুরা এক সাথে মিলে ফুল বিঝু দিনে পানিতে ফুল ভাসালে কেমন হয়?

নাগরির মা বলল, ওতো ভালো কথা। বেশ মজা হবেরে নিমোনের মা। এক সাথে সবাই পিনোন-খাদি পরব। আর মাথায় একটি করে নাকেশ্বর ফুল থাকবে। এমন সাজলে না, আমাদের স্বামীরা আমাদের চিনতে পারবে না।

নাগরির মায়ের কথা শোনে আমরা আবার হাসলাম। বিঝু যে আনন্দের দিন, খুশির দিন। বিঝু না আসার আগে আমরা বুঝতে পারলাম।

থুবথুব্যে মা বলল, গত বছর পিঠা বানানোর জন্যে কিযে কষ্ট হয়েছে! গ্রামের সব ঢেঁকি নষ্ট হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তিনটি ঢেঁকি ছিল। কে আগে, কে পরে এ নিয়ে ছোটো-খাটো ঝগড়াও হয়েছে।

পরান্যে মা বলল, গত বছর ঢেঁকির জন্যে কুশল্যের মায়ের সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। এ বছর তাই পরান্যের বাবাকে বলেছি, আগেই ঢেঁকি ঠিক করতে। করেছেও। এবার আর কোনো অসুবিধা হবে না, পিঠা বানাতে। আমাদের ঢেঁকিতে তোরাও সবাই যেতে পারবি।

আমি বললাম, এ বছর বিঝুর দিনে আমরা সবাই দল বেঁধে বেড়াব। মুখে মুখে কেউ না গেলেও মনে মনে সবাই যেন গায়, আমা দেশ্চান এধক দোল, নিত্য আহ্‌ঝিম মুই, বিঝু অক্কত কোগিল ডগরন, কোহুক, কোহুক।

আমার কথা শুনে আবার সবাই একসাথে হাসলাম।

বিঝু এলে আমাদের গ্রামের ঢেঁকিগুলো একদম অবসর থাকে না। বিঝু তিন চার দিন আগে থেকে পিঠা বানানোর জন্য ঢেঁকির শব্দ শোনা যায়। ঢেঁকির শব্দ শোনা যায় রাত গভীর পর্যন্ত। অনেকে ভোরে উঠে ঢেঁকিতে পিঠার গুরি করতে যায়। তখন ঢেঁকির শব্দ আর মুরগির ডাক এক হয়ে কতোই যে গম্ভীর লাগে। বিঝুর দিনে কিশোর-কিশোরিরা হৈ হুল্লোই করে গ্রামটা মাতিয়ে তুলে। মদ যারা খায় তারাও নাচ, গান করেই এবাড়ি থেকে ওবাড়ি বেড়ায়। অনেকের হাতে মদের বোতল। কারো মাথায় গামছা বাঁধা। কেউ আছার খায়। কেউ খায় মদ। কেউ গায় গান, কেউ দেয় তাল। কেউ হাসে, কেউ বলে কথা। তাদের মধ্যে কত যে আনন্দ! মেয়েরাও কত আনন্দ করে! মনের আনন্দে বিঝু দিনে রান্না করে। সান্যে পিঠা, বিনি পিঠা, বরা পিঠা, হুগা পিঠা, কলা পিঠা, ব্যাঙ পিঠা, আরো ধরণের পিঠা বানায়! অতিথিদের পরিবেশন করে। ভোরে উঠে পবিত্র মনে ভিক্ষু-সংঘদের জন্য পিন্ডু রান্না করে। সেই রান্না নিয়ে খুশি মনে বিহারে যায় ভিক্ষু-সংঘ দর্শন করতে। বুড়ো-বুড়িদের সেবা যত্ন করে। ছোটোদের স্নেহ, আদর করে। বিঝু মানে আনন্দ। বিঝু মানে খুশির দিন। এ দিনে পরিবারের সদস্যরা কোথাও গেলে সকলে বাড়িতে ফিরে আসে। সবাই মিলে আনন্দ করে। গ্রামেও নানা রকম খেলাধুলা হয়। কিশোরীরা বুকে খাদি বেঁধে, কোমরে কলসি নিয়ে দলে দলে নামে বুড়ো-বুড়িদের গোসল করাতে। বিঝু খুশির আনন্দ সবখানে সরে পড়ুক।

লেখক ঃ কবি, খাগড়াছড়ি।

তৃতীয় বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসনঃ আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন নয় কি?

- অনুরাগ চাকমা

শুরুটা করতে চায় আন্তর্জাতিক আইনের কিছু বিষয় নিয়ে। জাতিসংঘ সনদে বলা হলেছে, কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের ভুখন্ডে আগ্রাসন চালাতে পারবে না যদিও আত্মরক্ষার স্বার্থে আক্রান্ত রাষ্ট্রে আগ্রাসী রাষ্ট্রের হামলাকে প্রতিহত করার আইনগত অধিকার রাখে। সেজন্য জাতিসঙ্ঘ সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধসমূহ নিরসনের কথা বলা হয়েছে। আইনের ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথামও বলছেন, "আন্তর্জাতিক বিরোধ সমূহ মীমাংসা করার জন্য দুটো রাস্তা আছেঃ আইনগতভাবে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বর্তমান অবধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ যাবত অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের মধ্যে পার্মানেন্ট কোর্ট অব আরবিত্রেশন, লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘের নাম উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত আইন দিয়ে এসব প্রাপ্তিস্থানসমূহ পরিচালিত হয়, সেই আইনসমূহকেও শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। অধিকন্তু, অনেক আন্তর্জাতিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ আছে কিনা? রাষ্ট্রসমূহ এসব আইন মানে কিনা? যেসব রাষ্ট্র এসব আইন লংঘন করে, তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা যায় কিনা? আর যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে তারা আইন প্রয়োগের বেলায় নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখে কিনা? এসব প্রশ্ন নিয়ে যেভাবে বিংশ শতাব্দীর মানুষ ভেবেছে, তেমনি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে যখন দেখা যায়, ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর উপর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অব্যাহত গতিতে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার আসি আসল প্রসঙ্গে। গত পহেলা মে ২০১৩ সালে ইসরায়ের জেট বিমান দিয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উত্তর-পুর্ব দিকে অবস্থিত একটি সামরিক গবেষণাঘারে যে বোমা বর্ষণ করল তা সত্যিই নিন্দনীয় এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনও বটে। এই বর্বরচিত হামলায় এই সামরিক বৈজ্ঞানিক গবেষনা কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অবাক হতে হয় ইসরায়েল সরকারের যুক্তি শুনে। যেসব নাকি হামলা করতে বাধ্য হয়েছে এই কারনে যে, সিরিয়ার বেসামরিক সরকার হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসীদের হাতে মিসাইল এবং রাসায়নিক অস্ত্র পাচার করছে। ইসরায়েল সরকারের এই ভিত্তিহীন ও খোঁড়া যুক্তি দেখে আমরা কি বলতে পারি না, ইসরায়েল আক্রমণ করার জন্য এটা একটা অজুহাত দেখিয়েছে। তা যদি না হয়, তাহলে কোন একটা রাষ্ট্র কি অনুমান নির্ভর তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অন্য একটা রাষ্ট্রের বুকে অগ্রাসন চালাতে পারে? আন্তর্জাতিক আইন কি এই ধরনের বরবোরচিত হামলাকে সমর্থন করে? আরেকটি প্রশ্ন হল, আন্তর্জাতিক আইন মান্য

করার কাজটি কি কেবল হতদরিদ্র দেশসমূহের জন্য? তা কি আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েলের জন্য নয়? মনে তো হয় তাই। না হলে, আজকে আফগানিস্তান ও ইরাক আমেরিকার আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত হত না। এসব দেশের কোটি কোটি নিরীহ মানুষের অবর্ননীয় কষ্ট হতো না। এছাড়াও আমাদেরকে এই মহূর্তেই আরেকটি বিষয় দারুনভাবে ভাবায়। আইনকে যখন তার মূল আদর্শের জায়গায় প্রতিস্থিত করা না যেতে পারে, তখন সে আইন মারণাস্ত্রে পরিণত হয়। সহজ ভাষায় বললে, ধনী-শক্তিশালী দেশগুলো আইনের ফাঁকফোকর ও অপব্যাখার সুযোগ গ্রহণ করে গরীব-দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ঘাড়ে চেপে বসার বৈধতা পেয়ে যায়।

আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করলে চলে না, ৯/১১ সেপ্টেম্বরের হামলাতে যত আমেরিকান মারা যান, বিগত কয়েক বছরে তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর আক্রমনে আফগানিস্তানী ও ইরাকি মারা গেছেন। এখন যদি আইনের কথায় বলি, দুই-তিন হাজার আমেরিকান নিহত হওয়াতে এ লাদেন টপ ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী হইয়ে যান আর হাজার-হাজার আফগানিস্তানী-ইরাকি ন্যাটো বাহিনীর গুলিতে মারা যাচ্ছে, তাতে বুশ-ওবামারা সন্ত্রাসী হয় না। আইনের দৃষ্টিতে বুশ-ওবামারাও কি নরঘাতক ও সভ্যতার দুশমন নয়? এই প্রশ্ন নিয়ে কি কোন সভ্য জাতি আজ ও পর্যন্ত কোনদিন জাতিসংঘ গেছে? না তো যায়নি। তাহলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের চোখকি অন্ধ হয়ে গেছে? হায়রে বিশ্ব বিবেক। হায় আন্তর্জাতিক সুধী সমাজ।

আজকে ইরাক, কাল আফগানিস্তান আর পরশু সিরিয়া আক্রান্ত হবে- এ অবস্থায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। এজন্য জাতিসংঘ ও বিশ্ববিকেকের উপর উন্নয়নশীল দেশ সমূহের কোটি-কোটি জনগনের আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে। তাই উজ্জল উদাহরণ স্থাপন করল সিরিয়া। এ কারণে সে ইসরায়েলের ন্যাক্কারজনক হামলাকে নীরবে মেনে নিতে পারল না। সে ইতোমধ্যে তার পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে ইসরায়েলের দখলক্রত গোলান মরুভূমি অঞ্চলে দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ বাহিনীর প্রধানকে তলব করেছে এবং সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই হামলা ১৯৭৪ সালের দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমন চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছে। এমনকি, ইসরায়েকে আবারো হামলা হলে পাল্টা জবাব দেবে বলে হুমকি দিয়েছে।

যদিও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এ বর্বর হামলাকে নিন্দা জানিয়েছেন এবং সেই সাথে উভয় পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কথাতেই কি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? এই প্রশ্ন এই কারণে, আর থেকে কইয়েক বছর আগেও ২০০৭ সালে ইসরায়েল সিরিয়ার উপর একই কায়দায় আক্রমণ করে। তখনও কিন্তু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই আমার জিজ্ঞাসা, কোন সময় কি আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রয়োগ ছিল? নাকি জোর যার মুল্লুক তার ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি?

এছাড়া আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, ইসরায়েলের এই সামরিক পিছনে আমেরিকাই ছিল মূল পরিকল্পনাকারী। না হলে, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ যেন আমেরিকা কিছুই জানে না। তবুও প্রত্যাশিত ছিল, আমেরিকা কিছু না করলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরায়েলকে তার এই বাড়াবাড়ির জন্য শাসাবে। কিন্তু দুঃখজনক রাশিয়া ও ইরান বাদে সবাই চুপচাপ। সিরিয়ার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ঐতিহাসিক বন্ধু রাশিয়া তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, "ইসরায়েলের এই আক্রমন জাতিসংঘের সনদের লঙ্ঘন এবং উদ্দেশ্য যাই হোক না কোন এই হামলা কোনমতেই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে ইরানের সবোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী বলেছেন, "এটা সিরিয়ার উপর হামলা নয় বরঞ্চ ইরানের উপর হামলা বলে মনে করি"। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেবল চেচামেচির মধ্যে কি ইসরায়েলকে শায়েস্তা করা গেল? এভাবে আর কতদিন চলবে?

আরেকটি দিক নিয়ে আলোচনা না করলে হয় না। ইসরায়েলে এই হামলা সিরিয়ার মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্য দুনিয়া যে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সাম্য ও আন্তর্জাতিক আইনের কথা বলে তা মুখের বলি ছাড়া আর কিছু নয়। যে আন্তর্জাতিক আইন আছে তা ও তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভোমত্বকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এই অসাম্যের বিশ্বে গরীব রাষ্টগুলোকে টিকে থাকে হলে এখন একটা প্লাটফর্ম গড়ে তোলা অত্যাবশকীয় হয়ে পড়েছে যেটা শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে চাপ প্রয়োগ করবে। এটাই আজ আমার কাছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরম বাস্তবতা বলে মনে হয়। কিন্তু, এই রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে উঠা এবং তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরকার। তবে তার ও আগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ভিতরে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দন্দ্বসমূহ আছে সেগুলো মীমাংসা করতে হবে। এভাবে বিশ্ব শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

লেখক : প্রভাষক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে

- অনির্বাণ বড়ুয়া

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিসত্তা অন্যতম প্রধান। আবহমান কাল ধরে এদেশে বসবাসরত আদিবাসী নৃগোষ্ঠীগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ, জীবনধারা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি সম্পর্কে জানা এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটি এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও জীবনধারার বিষয়টি নিয়েও আরো ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। তঞ্চঙ্গ্যা জনধারার উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে তেমন কোনো ধারাবাহিক ও প্রামাণ্য তথ্যবহুল রচনা চোখে পড়ে না। তবে এক্ষেত্রে স্যার এ পি ফেইরি, ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন, স্যার রিজ্‌লি, শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ গবেষকগণের গবেষণামূলক তথ্যধর্মী লেখাগুলো আমাদেরকে আলোর পথ দেখায়। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সামান্য হলেও জানতে গিয়ে তাদের রচনাগুলো আমার সহায়ক হয়েছে; এর জন্য তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীকে দাইনাকও বলা হয়ে থাকে। চাকমা জাতিসত্তার ইতিহাস রচয়িতারা তঞ্চঙ্গ্যা বা দাইনাকদেরকে চাকমা জাতির একটি শাখা বলে মনে করেন। অনেকের মতে, চাকমা জাতিগোষ্ঠী চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও দাইনাক- এই তিনটি স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মারমা, রাখাইন আর বর্মী জনগোষ্ঠীরাও তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে দাইনাক বলে থাকে। বাংলাদেশের তঞ্চঙ্গ্যারা একসময় দাইনাক পরিচয়ে মায়ানমারের (বার্মা) আরাকান থেকে এসেছিল। 'দান্যাওয়াদি আরেরদফুং' (মতান্তরে 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেরদফুং') নামক গ্রন্থটি আরাকানদের কাহিনী নিয়ে রচিত। এ গ্রন্থেও তঞ্চঙ্গ্যা বা দৈংনাক বা দাইনাকদের কথা উল্লেখ আছে। এ ব্যাপারে স্যার এ পি ফেইরি, ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন, স্যার রিজ্‌লি প্রমুখ গবেষকগণ মায়ানমার এবং আরাকানে গিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁরা সে দেশের রাজা, রাজ্য, সাম্রাজ্য, রাজত্বকাল ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের লেখায় উপস্থাপন করেন। গবেষকগণের লেখা ও গবেষণাকর্ম থেকে দাইনাক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন গবেষকের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

দাইনাক জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'চাকমা জাতি' (১৯০৯) গ্রন্থে একটি বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণে দেখা যায়, ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা বা অধিপতি (মতান্তরে ব্রহ্মসম্রাট) মেঙ্গদি মনিজগিরির (মইচাগিরি) রাজা ইয়ংজকে সুকৌশলে আক্রমণ করেন। রাজা ইয়ংজ যুদ্ধে পরাজিত হন এবং দশ হাজার প্রজা ও

সৈন্যসহ বন্দী হন। এই দশ হাজার প্রজা বা সৈন্যকে এংখ্যং বা ইয়ংখ্যং নামক স্থানে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের পূর্বের উপাধি পরিবর্তন করে 'দাইনাক' আখ্যা প্রদান করা হয়। এভাবে দাইনাকদের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। চাকমা ঐতিহাসিকগণ রাজা ইয়ংজকে চাকমারাজা অরুণযুগ বলে শনাক্ত করেছেন। মনে করা হয়, দাইনাকরা চাকমা জাতিরই একটি অংশ। আবার অনেকের মতে, দাইনাক ও তঞ্চঙ্গ্যারা একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ফলে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি চাকমা জাতিগোষ্ঠী হতে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন আরাকান ইতিহাস 'দান্যাওয়াদি আরেরদফুং' গ্রন্থে দাইনাক শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের দিক থেকে দান্যাওয়াদি ও দাইনাক দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়। একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়। সাধারণতঃ একটি জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটে, সে অঞ্চলের নামানুসারেই সে জনগোষ্ঠী বা জনধারা নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছে বঙ্গে, বঙ্গদেশে বা বাংলায় বা বাংলাদেশে। দান্যাওয়াদি রাজ্যের নামের সাথে দাইনাক জাতিগোষ্ঠীর নামের সম্পর্ক ও মিল থাকা স্বাভাবিক।

'History of Myanmar' গ্রন্থে ড. খিন মং নগুনি গি দান্যাওয়াদি ও দাইনাকদের দসাথে কপিলাবাস্তুর শাক্যবংশের সম্পর্ক থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের 'দান্যাওয়াদি' অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, ৩৩৫২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বর্তমান আরাকানে মোট তিন পর্যায়ে দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কপিলাবাস্তুর শাক্যবংশের রাজপুত্র মারায়ু প্রথম দান্যাওয়াদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক কারণে মারায়ু ও তার অনুসারীগণ বর্তমান আরাকান রাজ্যে আসেন এবং দান্যাওয়াদির গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তিনি অনেক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ম্রো নৃগোষ্ঠী প্রধানের কন্যাকে বিয়ে করেন। মারায়ুর পর তাঁর বংশের আরো ৫৪ জন রাজা অত্যন্ত সফলতার সাথে দান্যাওয়াদিতে রাজত্ব করেন বলে জানা যায়।

উচ্চব্রহ্মের (Upper Burma) তগুং রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কংরাজাগ্রী দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। আবিরাজার মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র কংরাজাগ্রী ও কংরাজাঞী এর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বড় ভাই কংরাজাগ্রী পরাজিত হন। ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি দান্যাওয়াদিতে আসেন এবং দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দান্যাওয়াদি শাসন করেন কংরাজাগ্রী। তাঁর মৃত্যুর পর এ বংশের আরো ২৮ জন রাজা দক্ষতার সাথে দান্যাওয়াদি শাসন করেন বলে জানা যায়। কংরাজাগ্রী রাজবংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে তৃতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন সুরিয়া (সূর্য) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চান্দা সুরিয়া (মতান্তরে চন্দ্র-সূর্য)।

দান্যাওয়াদির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম পর্যায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয় মারায়ু এবং তাঁর বংশের রাজাদের দ্বারা; দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত আর শাসিত হয় আবিরাজার পুত্র কংরাজাগ্রী ও তাঁর বংশধর রাজাদের দ্বারা এবং

তৃতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত-শাসিত হয় চান্দা সুরিয়া ও তাঁর বংশের রাজাদের দ্বারা। তাঁদের সম্মিলিত শাসনকাল ছিল ৩৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কলদান নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল দান্যাওয়াদি নগর। এর অবস্থান বর্তমান সিত্তোয়ে শহরের কাছে। এই দান্যাওয়াদিই হচ্ছে আরাকান ভূখন্ডের প্রাচীনতম নগরী। এখানেই গড়ে উঠেছিল আরাকানের প্রথম সভ্যতা।

আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস থেকে আরো জানা যায়, ৫৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের বিহার বা প্রাচীন মগধ হতে চন্দ্র-সূর্য (Chanda Suriya) নামক একজন ভারতীয় সামন্ত জড় উপাসক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত চট্টগ্রাম ও আরাকান অধিকার করেন। তিনি সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজা হন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল ধান্যাবতী বা ধন্যাবতী। তিনিই প্রথম আরাকানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং আরাকানে মহামুনি বুদ্ধমূর্তি ও মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করেন।

মায়ানমারের রাখাইন ইতিহাসের আলোকে ধারণা পাওয়া যায় যে, দাইনাকদের উৎপত্তি ঘটেছে বার্মা ভূখন্ডের আরাকানে অবস্থিত প্রাচীন দান্যাওয়াদিতে। দান্যাওয়াদির আদিবাসী বলে তারা দাইনাক নাকে অভিহিত হয়েছে। ধারণা করা হয়, প্রাচীন দান্যাওয়াদির সেই অধিবাসীদের উত্তরসুরী দাইনাকদের একটি অংশ কোনো এক সময় আরাকান ভূখন্ড থেকে অর্থাৎ তাদের আবাসভূমি থেকে পার্শ্ববর্তী নাফ নদী অতিক্রম করে বর্তমান বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে তথা মায়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে প্রায় দেড়শ বছর চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের শাসনাধীনে ছিল।

অনুমান করা যায় যে, এ অঞ্চলটি দান্যাওয়াদির কাছাকাছি আর ভূ-প্রকৃতিগতভাবে প্রায় একই ধরনের বলে সুদূর অতীত হতে মায়ানমার ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে দাইনাকদের বসবাস। জনশ্রুতি আছে, দাইনাকরা এ অঞ্চলে এসে মাতামুহুরী নদীর কাছে তৈনগাঙে (মারমারা তৈনছং বলেন) তাদের সর্বপ্রথম বসতি গড়ে তোলে। কালক্রমে তারা সেখান থেকে পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিস্তৃত হয় এবং সম্ভবত তৈনছং এর আধিবাসী বলে তৈনছংগা বা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিতি লাভ করে।

জনশ্রুততি থেকে জানা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মায়ানমারের উত্তর আরাকানের সাক্‌দের একটি অংশ চট্টগ্রামের বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়। এ সময় আরাকান রাজ্যে বেশি বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তারা কলদান নদীর উজানে একত্রে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। এদিকে দাইনাকরাও সাক্ এবং বড়ুয়াদের সাথে একত্রিত হয়। সবাই একতাবদ্ধ হয়ে তৎকালীন বার্মার অক্সা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু রাজার নিকট তারা পরাজিত হয়। ফলে নিষ্ঠুর অত্যাচার নেমে আসে তাদের উপর। এ অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সেখান থেকে অনেকেই আরাকান ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে। যারা মাতামুহুরীর অববাহিকায় প্রথম আসে তাদেরকে সাপ্রেই বা সাপ্রেই বলা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মধ্যে একথা প্রচলিত

আছে। কথিত আছে, ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে সাপ্লেই গোত্রের একদল মানুষ গভীর অরণ্য পাড়ি দিয়ে আরাকান থেকে আলীকমে প্রবেশ করে। চট্টগ্রামের তৎকালীন শাসনকর্তা জামাল উদ্দীন তাদেরকে মাতামুহুরী অববাহিকায় বারটি গ্রামে বসবাস করার অনুমতি দেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, পঞ্চদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যারা আলীকদম বা মাতামুহুরী অববাহিকা হতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। আস্তে আস্তে অনেকেই বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ পর্যন্ত চলে আসে। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই পরবর্তীতে আস্তে আস্তে চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে এবং শঙ্খ নদীর অববাহিকা এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, জুরাইছড়ি, ওয়াগ্গা, ও রাইনছং (রাইংখ্যং) প্রভৃতি স্থানে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক গবেষকগণের গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্ত-প্রমাণ, অভিমত, জনশ্রুতি প্রভৃতি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী এতদঞ্চলে বহুকাল আগে থেকেই বসতি করে আস্ছে। তাদের মূল রাজ্য বা ভূখন্ড থেকে তারা বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে তাদের বসতি ও অস্তিত্ব ছিল। তারা দাইনাক নামেই পরিচিত ছিল এবং এখনও আছে। মায়ানমারের দান্যাওয়াদি তথা আরাকান রাজ্য ছিল তঞ্চঙ্গ্যাদের মূল আদিনিবাস।

তথ্যসূত্র :

১। *আরাকানের দান্যাওয়াদি: তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য*: শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যার নিবন্ধ; পহর জাঙাল; ৭ম বর্ষ; ৫ম সংখ্যা; ৯ আগস্ট ২০০৯;

২। *বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা*; খুরশীদ আলম সাগর; এপ্রিল ২০১১; শোভা প্রকাশ; ঢাকা।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ; খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা, বর্ণমালা এবং ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

- কর্মধন তন্‌চংগ্যা

ভূমিকা ঃ একটি জনগোষ্ঠী যদি নিজেকে জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে বা দাবী করতে চায় তাহলে তার 'নিজস্ব মাতৃভাষা' অন্যতম একটি মাধ্যম। তাই ভাষা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহকও বটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কটি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে তারা প্রত্যেকে নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ। এই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা এবং বর্ণচর্চার ইতিহাস বেশ সুপ্রাচীন। তঞ্চঙ্গ্যাদের পৌরানিক কাহিনী, নানা সাহিত্য, উবাগীত এর কাহিনী রাধামন-ধনপদি এবং বারোমাস আর গেঙ্গুলীদের (চারণ কবি) গানের কথার মধ্যে তারা নিজ(তঞ্চঙ্গ্যা)ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া বৈদ্য বা কবিরাজদের একাল-সেকাল তাদের তান্ত্রিক নানা উপাদান এবং ঔষুধের তালিকা (প্রেসক্রিপসন) এই বর্ণে লেখা হতো এবং হয়। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা শিশুদের জন্য নিজস্ব বর্ণমালার বই তৈরী করা হয়েছে এবং তারা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সে বই পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের এই ভাষার মধ্যে নিজস্ব একটা ধরণ বা মাধুর্য্য আছে, তারা কথা বলে কোমল নরম স্বরে। তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ আর কথ্যরীতি হচ্ছে 'আকারান্ত' যুক্ত। তঞ্চঙ্গ্যাদের বর্তমানে ব্যবহৃত মোট বর্ণমালার সংখ্যা ৩৬ টি। তার মধ্যে ৩১ টি ব্যঞ্জনবর্ণ আর ৫ টি স্বরবর্ণ।

খ. তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ব্যবহার : তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩১টি। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মতো তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণও স্বরধ্বনি ছাড়া উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা লেখ্য আর কথ্যরূপ একই, 'আ-কারন্ত (া)'। যেমন: ෆ,ə,∩,ꙍ,ε। এগুলির বাংলা রূপ হচ্ছে 'কা, খা, গা, ঘা, ঙা'। প্রত্যেকটা ক্রিয়াপদের শুরুতে 'আ' উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: যাবং,খাইন,যাইন ইত্যাদি। কিন্তু চাকমা বর্ণমালা মধ্যে লেখ্য আর কথ্যরূপ এক নয়। যেমন: তারা ঠিকই লেখ্যরূপ হিসেবে "আ-কারান্ত" 'কা, খা, গা, ঘা, ঙা' ব্যবহার করে কিন্তু ব্যবহৃত রূপ হিসেবে ব্যবহার করে "এ-কারান্ত"। যেমন: যেবং, খেবং খেইম, যে(ই)ম/যেইন ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় ক থেকে ম পর্যন্ত পচিঁশটি বর্ণকে স্পর্শধ্বনি বলা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এই পচিঁশটি বাংলা বর্ণের সাথে তঞ্চঙ্গ্যা পচিঁশটি বর্ণ মিল রয়েছে। তবে লেখ্যরূপে রয়েছে ভিন্নতা। যেমন: বাংলা বর্ণে উচ্চারিত হয়-'ক,খ,গ,ঘ,ঙ'। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে হয় 'কা,খা,গা,ঘা,ঙা'(আ-কারযুক্ত)। বাংলা বর্ণে উচ্চারণ হয়(ক 'অ') আর তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে হয়(কা'আ')। বাংলার ২৬ তম বর্ণ 'য' তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে নেই। তেমনিভাবে ড়,ঢ়,ৎ বর্ণগুলিও। তবে 'য়' বর্ণটি বাংলা বর্ণে ৩৫ তম অবস্থান হলেও তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে ২৬ তম(ω)। আর চারটি (শ,ষ,স,হ) শীষ ধ্বনি বা উষ্মবর্ণ-এর মধ্যে দু'টি 'স,হ'(ɔɔ,ɷ) তঞ্চঙ্গ্যা । তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে (শ,ষ,স) একই স্বরে এবং টানে উচ্চারিত হয় বলে তিনটি বর্ণের মধ্যে শুধুমাত্র 'স'(ɔɔ) বর্ণটি রাখা হয়েছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের তিনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ 'ং ,ঃ , ঁ ' ˚ , ঁ তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণে সরাসরি ব্যবহার না হলে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার হয়, তবে (ং) এর বিকল্প 'ঙ' হিসেবে ব্যবহার হয়।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মতো তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণেও ৫টি 'ঙ,ঞ,ণ,ন,ম'(ε,ဍ,ന,ထ,ω) নাসিক্য বর্ণ আছে তবে নাসিক্য ধ্বনি রয়েছে ৭টি 'ঙ,ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ'(ε,ဍ,ന,ထ,ω,˙, ˘)। বাংলা বর্ণমালার মতো প্রায় কাছাকাছি তঞ্চঙ্গ্যায় মাত্রাহীন বর্ণ- ৭টি 'এ, ও, ঙা, ঞা, ং, ঁ'(ə, ό, ε, ဍ,˙, ˘)। অর্ধমাত্রার বর্ণ- ৬টি ' খা, গা, ণা, থা, ধা, পা '(ə,ƨɯ,ന,ထ,ɑ,υ) । পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ২৫টি 'আ, ই, উ, কা, ঘা, চা, ছা, জা, ঝা, টা, ঠা, ডা, ঢা, তা, দা, না, ফা, বা, ভা, মা, রা, লা, সা, হা, য়া' (ɔ,ч,२,ന,ɯ,υ,ɲ,ȝ,ಬ,ɕ,ɕ,२,ಬ,ന,१,ထ,ɕ,ʊ,ɲ,ω,ɕ,ω,ɲ,ω,ω)। বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে উহ্যভাবে স্বরধ্বনি(অ) আসে, যেমনঃ 'ক্ +অ = ক' (ന̄ + ɔ́ = നa), 'চ্ + অ = চ'(ʊ̄ + ɔ = ʊa) ইত্যাদি। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালায় 'অ'(ɔ́) ধ্বনির পরিবর্তে 'আ'(ɔ) ধ্বনি সরাসরি আসে এবং লেখ্য ও কথ্য উভয়রূপে। তবে তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণমালায় 'ক' এর স্থলে 'কা' বর্ণ ব্যবহৃত হয়। অন্যসব ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। 'কা' এর উপর মাত্রাযুক্ত 'রেফ (´) ' হলে তখন 'কা' এর স্থলে 'ক' উচ্চারিত হয়। অন্যসব ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় 'রেফ'টি 'র' এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই দুটি বর্ণ আলাদা ভাবার কোন অবকাশ নেই। বাংলা বর্ণের 'ক' এর মতো তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণের 'কা'ও একটি পূর্ণরূপবর্ণ এবং একটি ব্যঞ্জনবর্ণ।

তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জনবর্ণ (উচ্চারণসহ) ঃ

ന = *কা* কিছিম্যা ə = *খা* গছিম্যা ∩ = *গা* চাইন্দা ɯ = *ঘা* তিনডাল্যা ε = *ঙা* ছিলামুআ

ʊ = *চা* দ্বিডাল্ল্যা ɲ = *ছা* মুচুর্য্যা ȝ = *জা* দ্বিপদলা ಬ = *ঝা* উড়াউড়ি ဍ = *ঞা* তিনডাল্যা

Q = *টা* দ্বিয়াদাত ɕ = *ঠা* ফুদাদিয়াদাত २ = *ডা* আঢুভাঙা ಬ = *ঢা* লেত্পরা ന = *ণা* পেত্তোআ

ന = *তা* গয়াঁদাত ∞ = *থা* জপদাত १ = *দা* দুলুন্দি ɑ = *ধা* তলমুআ ထ = *না* ফারবান্যা

υ = *পা* পারাল্যা ɕ = *ফা* উবরমুআ ʊ = *বা* উবরমুআ ɲ = *ভা* চাইত্থাল্ল্যা ω = *মা* বুগপদলা

ω = *য়া* চিমুচ্যা ɕ = *রা* দ্বিদাজ্যা ω = *লা* তলমুআ o = *ওআ* বাছন্যা ɲ = *সা* ভুরিবুক্যা

ω = *হ্আ* উবরমুআ

ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরবর্ণযোগে ব্যবহৃত কিছু চিহ্ন বা প্রতীকসহ বর্ণের উচ্চারণ ও ব্যবহার-

চিহ্ন	চিহ্নের	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ	স্বরবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ
˙	ന˙ এক ফুদা/ফুরা	কা এক ফুদা/ফুরা দিলে কাং	ɔ́ আ এক ফুদা/ফুরা দিলে আং
ঃ	ന :দ্বি ফুদা/ফুরা	কা দ্বি ফুদা/ফুরা দিলে কাঃ	ɔ: আ দ্বি ফুদা/ফুরা দিলে আং
`	ന` ডেল ভাঙা	কা ডেল ভাঙি দিলে কাই	ɔ` আ ডেল ভাঙি দিলে আই
˘	ന˘ চান ফুদা/ফুরা	কা চান ফুদা/ফুরা দিলে কাঁ	ɔ˘ আ চান ফুদা/ফুরা দিলে আঁ
¯	ന ന̄এয়া/মায্যা	কা পিছে কা মাইল্যে কাক্	ɔε̄ আ পিছে ঙা মাইল্যে আঙ্
–	ന –লম্বা টান	কা লম্বা টান দিলে কাআ...	ə- এ লম্বা টান দিলে এএ...
ˋ	ˋന অসল টান	কা অসল টান দিলে হ্কা (জোর)	ˋɔ আ অসল টান দিলে হ্আা(জোর)
ˏ	ˏന নিচল টান	কা নিচল টান দিলে কা (হালকা)	ˏɔ আ নিচল টান দিলে আ(হালকা)
।	থুম (দাড়ি)	বাক্য শেষ হলে এই চিহ্ন দেয়া হয়	
?	পুছার (প্রশ্ন)	প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে দেয়া হয়	
,	জিরান (কমা)	বাক্যের মাঝখানে থামলে ব্যবহার হয়	

যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার ঃ

বাংলা ভাষায় যুক্তব্যঞ্জন যেভাবে ব্যবহার হয় তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সেভাবে ব্যবহার হয় না। এখানে যুক্তব্যঞ্জন দ্বিত্ব হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন : কাক্কা 'কাক্‌কা'(നനന), মারফা 'মাম্‌মা' (ωωω)।

তঞ্চঙ্গ্যা স্বরবর্ণ (উচ্চারণসহ) ঃ

ℑ – আ পেটসুদা	৯ - এ লেতউবা	ন - ই ডালভাঙা	২ - উ বুর্নি	ó - ও ওমা উবর তুল্যে

তঞ্চঙ্গ্যা স্বরবর্ণ এবং ব্যবহার ঃ তঞ্চঙ্গ্যা স্বরবর্ণ ৫টি। বাংলা বর্ণের মতো তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণেও স্বরবর্ণ দুই প্রকার,১. হ্রস্বস্বর আর ২. দীর্ঘস্বর। তার মধ্যে হ্রস্বস্বর দুটি- ন (ই), ২ (উ)। আর দীর্ঘস্বর হচ্ছে তিনটি- ℑ (আ), ৯ (এ), ó (ও)। পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণ তিনটি- ℑ (আ), ন (ই), ২ (উ)। মাত্রাহীন স্বরবর্ণ দুটি- ৯ (এ), ó (ও)। তঞ্চঙ্গ্যা স্বরবর্ণ ৫টিই হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে বাংলা বর্ণের মতো অ,ঈ,উ,ঋ,ঐ,ঔ বর্ণগুলি অনুপস্থিত। কারণ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা এবং স্বরের সাথে এইসব বর্ণগুলি যায় না। ৫টি স্বরবর্ণ নিয়েই তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের স্বরবর্ণযুক্ত শব্দগুলি প্রকাশ করে। যেমন: [illegible]x(আনেইক/আনারস),[illegible](এইল/সবুজ),[illegible]x(ইককুল/স্কুল),[illegible](উরিন/হরিণ),[illegible] (ওলইদ/হলুদ)।

স্বরচিহ্ন ব্যবহার ঃ

স্বরবর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণেও সাথে এর ব্যবহার ও উচ্চারণ	স্বরবর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণেও সাথে এর ব্যবহার ও উচ্চারণ
ℑ́	a	ന́ কা উবর তুল্যে ক	২	،	ന، কা নিচে এক টান দিলে কু
৯	८	८ന কা এ-কার দিলে কে	২-	॥	ന॥ কা নিচে দুই টান দিলে কূ
ন	i	ন° কা বান দিলে কি	ó	८ ।	८ന। কা ও-কার দিলে কো
ন-	।	ন° কা বানি ফুদা দিলে কী	ó	˘	ന˘ কা ঐ-কার দিলে কৈ

তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে কার, ফলা , হসন্ত ও চিহ্ন ব্যবহার ঃ বাংলা বর্ণের মতো তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণেও কার,ফলা ও হসন্ত ব্যবহার রয়েছে। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে 'কার', 'ফলা' হচ্ছে যুক্তাক্ষরের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ আর ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে অনুচ্চারিত রেফের মত চিহ্নই হচ্ছে 'হসন্ত'। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে কার'র ব্যবহার গুলি হচ্ছে; বাংলা ব্যাকরণে 'আ-কার' ব্যঞ্জনবর্ণে উহ্যভাবে আসলেও তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে কিন্তু এই'আ-কার' সরাসরি এসেছে। কারণ তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণ কথ্য ও লেখ্যরূপই হচ্ছে 'আ-কারন্ত'। যেমন : তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে ന'কা' উপর রেফ বা মাত্রা দিলে ന́'ক' উচ্চারিত হবে। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে 'ঊ' বর্ণ নেই কিন্তু 'ঊ-॥' ( )কার আছে। উদাহরণ: ന (কা) নিচে দুটি টান দিলে ന॥ (কূ),কূরা(ന॥ര) উচ্চারিত হয়। ঠিক তেমনিভাবে 'ঐ' বর্ণ নেই কিন্তু 'ঐ-কার' 'ৈ' (˘) ,(ന˘)'কই/কৈ' ব্যবহার আছে আর'ঈ' বর্ণ নেই কিন্তু 'ঈ-কার' আছে 'ী'(ന°)। 'উ-কার' ক্ষেত্রে ന'কা' নিচে একটা টান দিলে ന، 'কু' আর 'কা'(ന) বান দিলে 'কি'(ന°), কা(ന) বানি ফুদা দিলে

'কী'(ო̊)উচ্চারিত হয়। ঠিক তেমনিভাবে 'ও-কার'(ϵ ।),' এ-কার', (e) ব্যবহার করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালায় 'য' বর্ণ নেই কিন্তু 'য-ফলা'(ȷ) আছে। উদাহরণঃ ó́ოᲛ́ᲕēnX(তঞ্চঙ্গ্যা)। (‿)র-ফলা ব্যবহার আছে। রেফ(´) ব্যবহার থাকলে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে এর উচ্চারণ বাংলা 'অর' মতো নয়। যেমনঃ কর্ম, এখানে (রেফ) 'র(অর)' হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে এটি 'একক' বর্ণ 'কা'(ო) থেকে 'ক'(ო́) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে 'মায্যা পাঠ',যেটি আমরা বাংলা বর্ণে হসন্ত (্) হিসেবে পেয়ে থাকি। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে 'মায্যা পাঠ'(¯) চিহ্নটি হালকা এবং উহ্য থাকে। যেমনঃ কাক্ (ოო̄)।

তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে চিহ্ন ব্যবহার ঃ

চিহ্ন	–	ϵ	‿	´	i	ǀ	ˌ	‖	˚	◡	˃	˂	ˋ
বাংলা ব্যবহার	কা-	কে	ক্র	কা (হালকা)	কি	কী	কু	কূ	কোআ	কৈ	কমা	কাই	কা (জোর)
তঞ্চঙ্গ্যা ব্যবহার	ო –	ϵო	ო‿	´ო	ო̊	ო̊	ოˌ	ო‖	ო˳	ო◡	ო́ ၇	ო˂	ˋო

চিহ্ন	–	⁄	̐	˙	ϵ।	:	?	,	।
বাংলা ব্যবহার	কাক্	ক্য	কাঁ	কাং	কো	কাঃ	প্রশ্ন	কমা	দাড়ি
তঞ্চঙ্গ্যা ব্যবহার	ო ო̄	ო ⁄	ო̐	ო˙	ϵო।	ო :	?	,	।

তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যা গণনা এবং ব্যবহার ঃ বাংলা বা ইংরেজী সংখ্যা গণনার আদলে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বা বর্ণেও সংখ্যা গণনা প্রচলিত আছে। অনেক আগে থেকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বৈদ্য বা কবিরাজ তাদের ঔষুধের তালিকে সংখ্যা লেখার প্রয়োজনে এই সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত এর সাথে সময়, দিন, তারিখ লেখা আর গণনা ক্ষেত্রেও তারা এই সংখ্যা ব্যবহার করত। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া ক্ষেত্রে এই বর্ণ ব্যবহার করছে। তঞ্চঙ্গ্যা এই সংখ্যা গণনা মারমা/বার্মিজ লিপির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু চাকমা সংখ্যা গণনার সাথে মিল নেই।

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
এক	দ্বি	তিন	চাই	পাইত্	চৈ	সাত	আইত্তো	ন-	দইত্

তঞ্চঙ্গ্যা ব্যাকরণ

পদ প্রকরণ

তঞ্চঙ্গ্যাতে বাংলার মত পদের সংখ্যা পাঁচটি। এই পাঁচটি পদগুলি হলো- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়া। নিম্নে তাদের উদাহরণসহ দেওয়া হলো।

ক. বিশেষ্য ঃ ক্যাং/ক্যায়াং(বিহার), তাঅল(দা), কাল্লাং(ঝুড়ি), কিচিং(পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্ন অংশ), তারেং (পাহাড়ের খাড়া ভাগ), মংচাং/মৈচাং(শ্রমন), মাইত্(মাছ), মুক্যা(ভুট্টা), ইক্কুল(বিদ্যালয়), গাইত্ (গাছ), মানেই/মান-ত্(মানুষ), মেলা (মেয়ে), পআ(ছেলে), ছাঅল(ছাগল), মুরাহ্ (পাহাড়),ছড়াহ্ (ঝিরি), গুরু (গরু) ইত্যাদি।

খ. বিশেষণ ঃ ধউল/লাবা(সুন্দর), ধুপ (সাদা), চিউন(ছোট), দাঅর(বড়), ভান্যা/বছং(মন্দ/খারাপ),মিদা(মিষ্টি) ইত্যাদি।

গ. সর্বনাম ঃ মুই (আমি), আমি(আমরা), আমার (আমাদের), ম-র(নিজের), তে (সে) , তুই (তুমি), তুমি (তোমরা), ইবা (ইহা), ইয়ান(এটি), উ(ই)আন(ঐখানা), ইয়ুন(এগুলি) ইত্যাদি।

ঘ. অব্যয় ঃ যুদি(যদি), ছালে(তাহলে), এনেক্কেয়্যা(এমন) ইত্যাদি।

ঙ. ক্রিয়া ঃ কহ্না(বলা), লনা(লওয়া), যানা(যাওয়া), গরানা,গআনা(করা), নিছানা/ন্যানা(নেওয়া), কোলুং/কঅনা(বলেছি), খাইয়ং (খেলাম), খাইয়ি (খেয়েছি), ক-উন(বলব), ত-উন(রাখবো), লউন(নেবো) ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশক ঃ

বাংলা ভাষার অনুরুপ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাতেও টি/টা, খানা/খানি এবং গুলি/গুলা পদাশ্রিত নিদের্শক শব্দ সম্ভার রয়েছে।

ক. তঞ্চঙ্গ্যাতে প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের অন্তে শব্দের শেষে সবসময় বাংলার 'টি' এর আদলে 'বা' যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন -

মেলা + বা = মেলাবা (মেয়েটি)

পআ + বা = পআবা (ছেলেটি)

কুরা + বা = কুরাবা (মোরগটি)

গুরু + বা = গুরুবা (গরুটি)

কুমুরা + বা = কুমুরাবা (কুমড়াটি)

খ. তঞ্চঙ্গ্যাতে প্রাণীবাচক ব্যঞ্জন অন্ত্যে শেষে সব সময় ***'অয়া'*** যুক্ত হয়। যথা-

বাপ্‌প+অয়া = বাপ্পআ (বাবাটি)।

মাচ+অয়া = মাচ্ছআ (মাছটি)

গাচ+অয়া = গাচ্ছআ (গাছটি)

মানুচ+অয়া = মানুচ্ছুয়া (মানুষটি)

ছাঅল+অয়া = ছাগলআ (ছাগলটি)

গ. বাংলা খানা/খানি স্থলে তঞ্চঙ্গ্যাতে ***'য়ান, লান, আন, য়ানি'*** যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যথা-

চেয়া + রান = চেয়ারান (চেয়ারখানা)
টেবি + লান = টেবিলান (টেবিলখানি)
ঘর + আন = ঘরআন (ঘরখানা)
চেয়া + রানি = চেয়ারানি (চেয়ারখানা)
টেবি + লান = টেবিলান (টেবিলখানা)
টেবি + লানি = টেবিলানি (টেবিলখানি)

ঘ. বাংলার গুলি/গুলা স্থলে তঞ্চঙ্গ্যাতে **'উন, উনি'** যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যথা-
চেয়ার + উনি = চেয়ারগুলি
টেবিল + উনি = টেবিলগুলি
মানুচ+উন = মানুষগুলি

ধাতু ঃ ক্রিয়া মূলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ধাতু। যথা : মুই খায়ং (আমি খেয়েছি)। এখানে খায়ং এবং খাইন এর ক্রিয়া পদটি মূল হল খা। অর্থাৎ উহার ধাতু হলো খা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণে ক্রিয়ার মূল, ধাতুরূপ ও ব্যবহারিক মূলবর্ণ একই 'খা', এর তঞ্চঙ্গ্যা উচ্চারণ 'গছিম্যা খা'। অনুরূপভাবে গাইন (গাইবো), পাইন(পাবো) ইত্যাদি ক্রিয়ার পদগুলি মূল বা ধাতু হলো গা, পা। আর এই গা, পা গুলি তঞ্চঙ্গ্যাদের ব্যবহারিক ব্যঞ্জনবর্ণ।
ক্রিয়ার কাল ঃ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় তিন প্রকার কাল রয়েছে। সেগুলি হলো- বর্তমান কাল, অতীত কাল আর ভবিষ্যত কাল। নিম্নে তিনটি কাল উদাহরণসহ দেখানো হলো ঃ

কাল	*তঞ্চঙ্গ্যা*	*বাংলা*
বর্তমান কাল	মুই ভাত খাং	আমি ভাত খাই
অতীত কাল	মুই ভাত খাইয়ং	আমি ভাত খেয়েছিলাম
ভবিষ্যত কাল	মুই ভাত খাইন	আমি ভাত খাব

বাক্য ও বাক্য গঠন প্রক্রিয়া ঃ তঞ্চঙ্গ্যাতে বাক্যের গঠন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম এবং ক্রিয়া বসে একটি অর্থবোধক বাক্য গঠিত হয়। অর্থ্যাৎ এর গঠন প্রক্রিয়া হবে Subject +Object+ Verb.
১. কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া'র ব্যবহার-

কর্তা	*কর্ম*	*ক্রিয়া*	*অর্থবোধক বাক্য*
মুই	ভাত	খাং	আমি ভাত খাই
তুই	ভাত	খাইত	তুমি ভাত খাও
তে	কাম	গরে	সে কাজ করে

২. তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কি, কেবাই, ক্যা, কুত্তুন যোগে প্রশ্নবোধক বাক্য গঠিত হয় যেমন – ক. ত নায়াং কি ?(তোমার নাম কি ?), তুই কেবায় ভাত ন খাবে ?(তুমি কেন ভাত খাবে না ?), তুই ক্যা তা সমারে ন যাবে ? তুই কুত্তুন আসত্তে ?(তুমি কোথায় থেকে আসতেছ ?)। আবার প্রশ্নবোধ বাক্যে প্রশ্নবোধক অব্যয় ব্যবহার করেও প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন করা যায়। যেমন ঃ তুই ভাত খায়ত নি ? (তুমি ভাত খেয়েছ নাকি ?), তে কাম গোজ্যেদে নে ? (সে কাজ করেছিল নাকি ?)। আবার 'না বা নি' তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'না বোধক' বাক্য হিসেবে ব্যবরিত হয়। তবে এখানে বাংলা না বোধক বাক্য আর তঞ্চঙ্গ্যা না বোধক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় না বোধক বাক্য নঞার্থে 'না'ক্রিয়ার শেষে বসে অর্থাৎ প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম, তারপরে 'না' ক্রিয়া শেষে বসে। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম এবং না ক্রিয়ার প্রথমে বসে বাক্য গঠিত হয়। যেমন ঃ

কর্তা	*কর্ম*	*নঞার্থে 'ন'*	*ক্রিয়া*	*না বোধক বাক্য/বাংলা*
তুই	ভাত	ন	খাবে	তুমি ভাত খাবে না ?
মুই	গরত্	ন	যাইন	আমি বাড়িতে যাবো না ?
তে	গরত্	ন	যাব	সে বাড়িতে যাবে না ?

বচন ঃ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বচন ব্যবহারের সময় বা, আন, কআ একবচন এবং উন,উনি, লক, কুন, আনি শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয়।

একবচন		*বহুবচন*	
তঞ্চঙ্গ্যা	*বাংলা*	*তঞ্চঙ্গ্যা*	*বাংলা*
পয়া/পয়াবা	ছেলেটা	পয়াউন	ছেলেগুলি
টেয়া/টেয়াবা	টাকাটা	টেয়াউন	টাকাগুলি
ঘর/ঘরান	ঘরটি	ঘরুনি	ঘরগুলি
চেরাক/চেরাক্কআ	চেরাগটা	চেরাগকুন	চেরাগগুলি
কুরাহ্/কুরাঅআ	কুকুরটা	কু-রুন	কুকুরগুলি
গাবুর	যুবক	গাবুরলক	যুবকদল
মেলা	মেয়ে	মেলালক	মেয়েদল
জুম	জুম	জুমুনি	জুমগুলি
দেশ	দেশ	দেচ্ছুনি	দেশগুলি
মাচ	মাছ	মাচ্ছুন	মাছগুলি
ফুল	ফুল	ফুলুন	ফুলগুলি
শিল	শিল	শিলুন	শিলগুলি
পাথর	পাথর	পাথরুন	পাথরগুলি

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে (বিশেষ করে শ্বশুর গোত্রের) বড়জন কারোর সাথে কথা বলার সময় একবচন বা বহুবচন ক্ষেত্রে 'দাই' শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়। আবার বড়জনও ছোটজনকে সম্মানার্থে 'দাই' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। আবার বহুবচন ক্ষেত্রে 'লক' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়, যেটি বচন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ঃ বাবাহ্ দাই(বাবা), বাবু দাই (জামাই দাই)/বাবু লক(বাবু সকল), জামাইদাই (জামাইদাই)।

আবার 'দাই' অনেক ক্ষেত্রে তুমি অর্থও বহন করে। যেমন ঃ দাদা দাই (দাদা তুমি), বেবে দাই (দিদি তুমি/দিদি সকল), বুসি দাই (ভাবী তুমি/ভাবী সকল)। তবে দাই শব্দটি বক্তার উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি এবং পরিবেশগত প্রয়োগের উপর নির্ভর করবে। সে কি একবচন বলছে নাকি বহুবচন বলছে।

লিঙ্গ ঃ লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। কাজেই যে চিহ্নের সাহায্যে ভাষার নামবাচক শব্দগুলি স্ত্রী,পুরুষ,ক্লীব এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয় এমন বুঝায় যায় তাকে লিঙ্গ বলে। তন্‌চংগ্যা ভাষায়ও লিঙ্গ চার প্রকার। এগুলি হলো পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ,ক্লীবলিঙ্গ এবং উভয়লিঙ্গ।

ক. পুংলিঙ্গ ঃ যেসব শব্দে পুরুষ জাতি বুঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন- বাপ (বাবা), বাই (ভাই),দাদু (নানা), কাক্কা (চাচা),পত্র া(ছেলে), মামু(মামা)।

খ. স্ত্রীলিঙ্গ ঃ যেসব শব্দে স্ত্রী জাতি বুঝায় তাকে স্ত্রীঙ্গি বলে। যেমন-মা, ভোন(বোন), ঝি(মেয়ে), বাইনি(বাগিনী), সালী(শ্যালিকা),সোরি(শ্বাশুরী), কাক্কী(চাচী), নোনু(নানি/দাদী), মেলা(ময়ে মানুষ)।

গ. ক্লীবলিঙ্গ ঃ যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কাউকে বুঝায় না তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন- গাইত্‌ (গাছ), বা-ত (বাঁশ), কারেগা(চেয়ার), আম্‌(ঘর), পাদুরি(কোমড় বন্ধনি), মাদাকাবঙ(পাগড়ি), পিনউন(থামি), কুরা(মোরগ/মুরগী)।

ঘ. উভয়লিঙ্গ ঃ বাংলার মতো তন্‌চংগ্যাতেও এমন কিছু বিশেষ্য পদ রয়েছে যে শব্দগুলিকে দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বুঝায়, তাকে উভয়লিঙ্গ বলে। যেমন- চিয়ন পআ(শিশু), মানউত্‌(মানুষ), সমাজ্যা(বন্ধু)।

লিঙ্গান্তর ঃ তন্‌চংগ্যা ভাষায় পুংলিঙ্গ বাচক শব্দগুলিকে কতিপয় প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিংঙ্গ বাচক শব্দে রূপান্তর করা যায়। নিম্মে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল-

১.সাধারণভাবে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ। এখানে তন্‌চংগ্যা,বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিঙ্গ পরিবর্তন দেখানো হলো-

নেক (স্বামী)	মোক (স্ত্রী)
জামাই	বো (বউ)
আসু(নানা)	নোনু(নানি)
পিসা(ফুফু)	ফেফে(ফুফি)
মামু(মামা)	মামি
বুআ/বুড়া	বু-ই/বুড়ি
কাক্কা/কুরা(চাচা)	কাক্কি/কু-ই/কুরী(চাচি)
মরত্‌(পুরুষ)	মেলা(মেয়ে)

২.'আ' যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ 'ই' যোগে পরিবর্তিত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
কাক্কা(চাচা)	কাক্কি(চাচি)
বুআ/বুড়া	বু-ই/বুড়ি
রানা(বিপত্নীক)	রানি(বিধবা)
ববা(বোবা ছেলে)	বুবি(বোবা মেয়ে)
কানাহ্(কানা ছেলে)	কানিহ্(কানা মেয়ে)

৩.'ধন'/'চান' যোগে নাম বাচক পুংলিঙ্গ শব্দ 'বি'/'পুদি' যোগে পরিবর্তিত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
ধন/ধনা	ধনবি/ধনপুদি
পুনংচান	পুনংবি
মনিচান	মুনংপুদি

কারক ও বিভক্তি ঃ

বাংলা বা অন্যন্যা ভাষার মতো তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়ও কারক এবং বিভুক্তির প্রয়োগ রয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা আর চাকমা কারক ও বিভুক্তি প্রায় একই। নিন্মে উদাহরণসহ প্রদান করা হলো-

কারক	*বিভুক্তি*	*তনচংগ্যা/উদাহরণ*	*বঙ্গানুবাদ*
কর্তৃ	শূন্য, এ, য়	টারেঙে বাছরত যায়	টারেঙ বাজারে যায়
কর্ম	রে	তুই সনাবিরে ভাত দে	তুমি সনাবিকে ভাত দাও
করণ	লই/দি	ইয়ান দরিলই বান ইদি কলম্মআদি লেঘ্	এটি দড়ি দিয়ে বাঁধ এখানে কলম দিয়ে লেখ
সম্প্রদান	রে	তুমি ভান্তেরে সআন দ	তোমরা ভিক্ষুকে খাবার দাও
অপদান	থুন	তে ঘরথুন আসের	সে বাড়ি থেকে আসছেন
সম্বন্ধ	র	ইবা ফলনার/ধলনার বই	এটি অমুকের/সমুকের বই
অধিকরণ	ত	তে ঘরত আহে	সে বাড়িতে আছে

সম্প্রদান রে তুমি ভান্তেরে সআন দ তোমরা ভিক্ষুকে খাবার দাও
অপদান থুন তে ঘরথুন আসের সে বাড়ি থেকে আসছেন
সম্বন্ধ র ইবা ফলনার/ধলনার বই এটি অমুকের/সমুকের বই
অধিকরণ ত তে ঘরত আহে সে বাড়িতে আছে

প্রায়-সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ঃ

১. অধা- ইচ্ছা পূরণ
অয়া- উৎসব বিশেষ

২. অক্- সত্য
অক্ত-টিকঠাক/যর্থাথ
অত্ত- অর্থ/মেনিং

৩. অলং অলং- বমি বমি ভাব
অলঙ-গভীর
অলঙ গাত্- গভীর গাত

৪. ব-অত্- বিনষ্ট হওয়া
বোউত্- বস/জিনিস

৫. ব = বাতাস
বঅ = এক ধরণের শক্ত সূতা বিশেষ

৬. বা-অ-রা = অসুন্দর
বা-ঞ-রা = কাধঁ
ব-অ-রা = কানে না শুনা

৭. সঅত্- জিদে
সাঅত্- হঠাৎ
সআত্- স্বাদ আছে যা

৮. যয়ার- ঠিকটাক হওয়া
য়ুয়ার- তৈরী হওয়া
জুয়ার/জুআল-যোগান হওয়া

৯. কুরেকারে- আশেপাশে
কুরেকারা- মন্দ পরিস্থিতি বিশেষ

১০. বঅরা- পুকলা দাঁত
ব-অ-রা- বধির

১১. জু-অ -ঠান্ডা
জু-র - ঠান্ডা

১২. বারি- বেত
ভারি- বেশী

১৩. বারি খা - বেরে ভাত খাও
বারিসা- বর্ষাকাল

১৪. বেয়ানা- ব্যাঙাচি
ভেয়ানা- জিহ্বা বের করে ভিংচি কাটা

১৫. সাবাক- দুধের সর
সাবাক- তরকারীর জোলের বাকি অংশ

সমার্থক বা প্রতিশব্দ ঃ

১. বাবা– বোঙগু, বাপ্‌পয়া, বা(আ)বা, বা(অ)।
২. মা– মাঙগু, মা(অ), মা(আ)মা।
৩. তাড়াতাড়ি – ঝাদি ঝাদি, ঝাদি মাদি, সুরুতগুরি, হুড়িমুড়ি।
৪. দুই বার – দ্বিপল্যা, দ্বিগেদা, দ্বিজলা।
৫. অল্প – ইত্তুক, ইক্কিনি, এক্কেনা।
৬. ময়লা – আনাচার, কারিচ্ছ্যা, আল্লয়াং, আরা-কাড়া ইত্যাদি।

প্রবাদ ও প্রবচন ঃ

১. সর্গ গু খাই দিক্‌কনি/নে ?
- ভালো জিনিস খেয়ে দেখেছ কি ?
২. সাপপয়া উলে পুদাই-দ, ব্যাঙয়া উলে ফালাই-দ
- পাশে কোন জিনিসকে পড়ে থাকলে না দেখলে উক্ত উক্তিটি করা হয়।
৩. পেলায় পেলায় বাজ্জাবাড়ি খানা।
- পাশাপাশি থাকলে একটু আগটু সমস্যা সৃষ্টি হবেই।

৪. পয়ায় ন কানিলে দুধ খায় ন পান/পায়।

- না চাইলে বা দাবী না করলে কোন কিছু পাওয়া যায় না।

৫. পেদত্ বোক মুয়ত্ লাইত ।

- ক্ষুধা লাগলেও লজ্জার কারণে খুজতে না পারা।

৬. এক্কয়া শিলৎ এক্কয়া কাঁড়া।

- নানা মুনির নানা মত বা যার ঘওে সে রাজা।

উপসংহার ঃ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমি যেমন চাইব আমার ভাষা ও বর্ণমালা বেঁচে থাকুক এবং বিকশিত হোত তেমনি অন্য একটি ভাষাগোষ্ঠীও এই চাওয়ার অধিকারটা রাখতে পারে। তার এই চাওয়া যেন বঞ্চিত না করা হয়। কারণ আমি দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষা বিকাশে এবং চর্চার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি চর্চা আর ধারণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমি শেষে এসে একটা কথা বলব- বর্ণ নেই, জনসংখ্যা কম, ভাষা দুর্বল, দুর্গমতা, কম শিক্ষিত বা অন্যকোন অজুহাতে যেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গুলিকে তাদের ভাষা, বর্ণমালা চর্চা এবং সংরক্ষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত বা অবহেলা যেন করা না হয়। কারণ উন্নয়নের সংজ্ঞা হচ্ছে শূন্য থেকে শুরু করা।

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই।

আসলে দোষ কার (?)

- মিলিন্দ তন্‌চংগ্যা

ছেলের নাম প্রবাল। ছেলেটি খুব ডানপিটে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘুরে বেড়াত। মেধাও কম নয়। প্রতিটি শ্রেণিতে ১ম/২য় স্থান দখলে রাখত। বাবা-মাও খুব খুশী যে ছেলেটি বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হবে এবং সুশিক্ষিত হবে। এভাবে দিন যায়, রাত আসে, ভোর হয়। আবার অন্য দিনের মতো বাবা-মা জুমে কাজ করতে যায় আর সময় সূচী অনুযায়ী ছেলেটি বিদ্যালয়ে যায়। ছেলেও দিনে দিনে বড় হচ্ছে তার পাল্টা দিয়ে শ্রেণির কাজ ও পড়ালেখাসহ বইপত্র বেড়েই চলছে। তার সাথে পড়ালেখার খরচাপাতিও ক্রমশ বেড়েই চলছে। তবুও বাবা-মা'র কোন দুঃখ নেই, কারণ ছেলের সাফল্যে তারা গর্বিত। এভাবে দেখা গেল মাধ্যমিকে সে এ প্লাস পেল আর বিদ্যালয়ে ও গ্রামে তার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে সে এক উদাহরণ হিসেবে স্থান করে নিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় গ্রামে কোন কলেজ নেই। হয় তাকে গ্রাম ছেড়ে কালোধোয়ার দালানকোটার এলাকায় এসে পড়ালেখা করতে হবে অন্যথায় কোন উপায় নেই। অন্য দিকে বাবা-মার ইচ্ছা থাকলেও অনেকটা দ্বিধাগ্রস্থ কেননা আর্থিক ব্যাপার-স্যাপার যেমন রয়েছে আরেকদিকে প্রবালের একটা ছোট বোন ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। একদিন গ্রামের প্রধান (কার্বারী) প্রবালের বাবাকে পরামর্শ দিল যে, শহরের সরকারি কলেজে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য পরে অবশ্য প্রবালের এক চাচা তার (প্রবাল) লেখাপড়ার স্বার্থে এগিয়ে আসে। যাক্ প্রবাল সরকারি কলেজে ভর্তি হল। সব কিছু ঠিক ভাবে এগিয়ে চলছে এবং দিনও ভাল-মন্দ যাচ্ছে। এভাবে দেখতে দেখতে প্রথম বর্ষ শেষ হল। তন্মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু নতুন বন্ধু-বান্ধবী তৈরি হল। প্রথম বর্ষ বেশ কৃতিত্বের সাথে অতিক্রম করল। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে দেখা গেল প্রবালের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সেই আগের মত পড়ালেখা করত না। এমনকি বাবা-মায়ের তেমন খোঁজ নেয় না, তাঁদের কথা অবাধ্য করে, এতে তার (প্রবালের) মা-বাবা ছেলেকে নিয়ে খুব চিন্তিত। যে ছেলে বাবা মায়ের, বড় জনের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত কিন্তু এখন কি সমস্যা হল, কেন এরকম হল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজার জন্য তারা চেষ্টা করছে। পরবর্তীতে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল ছেলে খারাপ বন্ধু-বান্ধবীর খপ্পরে পড়ছে। সে তাদের সাথে মিশত যারা পড়ালেখা চিন্তায় করে না, সারাক্ষণ মাদক নিয়ে থাকে এবং যাবতীয় অসামাজিক কার্যকলাপ করে। এক্ষেত্রে তার বান্ধবীরাও পিছিয়ে নেই। সারাক্ষণ আবোল তাবোল চিন্তা আর যেখানে সেখানে বসে আড্ডা তাও ভাল আড্ডা নয়।

আর বড়জনদের কথা তো এক পয়সাও দাম দেয় না। তার বন্ধু-বান্দবীরা যেরকম ফাঁকি বাজি প্রবালও সেরকম ফাঁকি বাজি হয়ে গেল। একজন ভাল বা মন্দ বন্ধু বা বান্ধবীই কিন্তু একটা বন্ধুকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কথায় বলে না, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" প্রবাল খারাপ হয়ে গেছে, আগে মাদক থেকে ২০০ হাত দূরে আর এখন মাদক-ই তার কাছের বন্ধু হয়ে গেল। আগে তার মাসিক বাবদ খরচ লাগত তিন থেকে-সাড়ে

তিন হাজার টাকা আর এখন সে খরচ করে ৪-৫ হাজার টাকা। অন্য দিকে তার ছোট বোনের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অতিরিক্ত যে টাকা খরচ হতো তা মাদক আর খারাপ কাজে ব্যবহার করতো সর্বশেষে প্রবালের পড়ালেখা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। আর জীবনটা হয়ে যায় বোঝা।

উপরোক্ত ছোট কেস স্টাডির মাধ্যমে পাঠকদের সাথে আমি একটি বিষয় ভাগাভাগি (শেয়ার) করে নিতে চাই। বর্তমান সময়ে সমাজে এরকম অনেক প্রবাল ও তার বন্ধু-বান্ধবীদের মতো মানুষ দেখা যায়। এমনো দেখা যায়, অনেক প্রবাল অকালে দুনিয়া থেকে ঝড়ে যাচ্ছে। অনেকে এই বিষয়টি সমাজের প্রেক্ষাপতে স্বাভাবিক বলে সায় দেন। কিন্তু আসলে এটা স্বাভাবিক নয়। এগুলো আমাদের সামাজিক অবক্ষয়। এসবের জন্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দায়ী, প্রবাল দায়ী নয়। সমাজ মানুষকে প্রভাবিত করছে। যার কারণে মানুষ সমাজকে পরিবর্তন করতে পারছে না। সমাজ এরকম হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ বা যুক্তি রয়েছে।

১। সমাজ ব্যবস্থা ভারসাম্য না থাকা।
২। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং চর্চা ও
৩। প্রযুক্তির অসদ্ব্যবহার।

প্রথমত আমি এই কারণে সমাজকে ভারসাম্যহীন বলছি। আমরা যদি খোলা চোখে একবার সমাজের দিকে গভীরভাবে নজর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখি তাহলে সমাজে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর লোকের বাস পাবো। তন্মধ্যে হচ্ছে উচ্চ শ্রেণী, উচ্চ মধ্য বিত্ত শ্রেণী, মধ্য-বিত্ত শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হচ্ছে সুশীল সমাজ। সমাজ ভারসাম্য হীন হয়েছে বিশেষত উচ্চ শ্রেণীর লোকের কারনে। তারা হলেন অর্থকারী এবং সম্পত্তির মালিক। তারা ইচ্ছা করলে মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তাদের মধ্যে সামাজিকতার ছায়া দেখা যায় না। যা ইচ্ছা তা করে আর সন্তানেরা যা চাই তা কিনে দেয় কিন্তু ভেবে দেখেনা সন্তানের ক্রয়কৃত দ্রব্য সঠিক কাজে ব্যবহার করছে কিনা। উক্ত বিলাস শ্রেণীর চাওয়া পাওয়া প্রচুর।

সেই উচ্চ বিলাস শ্রেণী'ই আবার অসাধু কাজ করে। পাঠকেরা একটু ভেবে দেখুন এই উচ্চ বিলাসী লোকেরা অনেকে কিন্তু অসৎ উপায়ে অর্থ অর্জনের ব্যবসার সাথে জড়িত (সবাই নয়) আর তারা নিম্ন বিত্ত বা ঝড়ে পড়ে যাওয়া ছাত্রদের এসবকাজে লাগাচ্ছে। এহেন সমাজ ব্যবস্থা যে, উচ্চ বিত্তের ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা করে পরদেশে যারা নিজের ভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেকাংশে (সবাই নয়) অপরিচিত। সেই উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই কিন্তু প্রবালদের শেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে এবং ব্যবহার করছে। যা প্রকৃত পক্ষে কোন ভালো দিক তো নয় বরং পরোক্ষভাবে সন্তানদেরকে এসব শেখানো হচ্ছে। আমরা যদি প্রজন্ম বিশ্বাস করি তাহলে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, অনুজরা সব সময় অগ্রজদের অনুসরণ করে। সুহৃদ পাঠক এখনো দেখবেন বাবা মস্ত বড় ব্যবসায়ী ছেলে মাত্র অষ্টম বা পঞ্চম শ্রেণি পাস আর তার সার্টিফিকেট হল একটি ডিসকভারি, পালসার হোন্ডা। যা

বর্তমানে অনেক তরুণ বা তরুণীর প্রাণের চাহিদা। যাদের খপ্পরে অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে। এমনকি নষ্ট পর্যন্ত হচ্ছে। উচ্চ মধ্য বিত্ত শ্রেণীরাও এ জাতীয় কার্যকলাপের মধ্যে পিছিয়ে নেই। তারাও সুযোগ পেলে অনেক কিছু করে ফেলে। যা সমাজের জন্য খুব মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। আমার দৃষ্টিতে মধ্যবিত্তরায় সমাজে অনেক কিছু অবদান রাখছে। তারা সমাজের জন্য অনেক কিছু ভাবে যদিও অনেক সময় ব্যর্থ হয় কিংবা সামর্থ্যের অভাবে অনেক কিছু করতে পারে না। নিম্ন বিত্তরা সমাজের একটা বিশাল অংশ। তাদের হাতে খড়ি এবং চিন্তা চেতনাগুলো এত নিখুঁত যে, যা একজন উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর লোক কখনো ভাবে না। তারা সমাজের সকল মানুষের কথা ভাবতে পছন্দ করে এবং খুব সহজ সরল ভাবের মানুষ। যদিও মাঝে মধ্যে নুন আনতে পানতা ফুরায় তবুও তারা স্বপ্ন দেখে দেশ ও সমাজের জন্য। আর অন্য দিকে উচ্চ বিত্ত বা উচ্চ মধ্য বিত্ত শ্রেণীরা (সবাই নয়) তাদের সরলতা সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করে। এমনকি পথে বসাতেও দ্বিধাবোধ করে না। তারা (খেতে খাওয়া সাধারণ মানুষ) আবার বাঁচিয়ে রাখছে আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষা কেননা তাদের মধ্যে কোন কৃত্তিমতা নেই। আমাদের আদিবাসীরা যারা খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে আর যারা শহরে বা তার কাছাকাছি বাস করে তাদের মধ্যে বাক্যগত বা শব্দগত পার্থক্য খুঁজলে খুব সহজে অনুমেয়।

২। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং চর্চাঃ

দেশ, সমাজ এবং সময় অনেক বদলে গেছে। সময়ের স্রোতে মানুষের চিন্তা চেতনাও পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন আবার দু'ভাবে হতে পারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইতি এবং নেতি দুইটি পারম্পরিক বৈপরীত্য। সচেতন হওয়া, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো ও আত্মসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ভাল দিকগুলো হলো ইতিবাচক। আর যত্রতত্র মাদক, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, বিভিন্ন নৈতিক ও সমাজ বিরোধী কাজ বা দুর্নীতি বৃদ্ধি হচ্ছে নেতিবাচক দিক। বর্তমান সময়ে আমাদের আদিবাসী তরুণ সমাজ আধুনিকতার দোহায় দিয়ে অত্যাধুনিক হয়ে যাচ্ছে। যা মূলধারার সংস্কৃতির সাথে তলিয়ে যাচ্ছে। আর এমনো একটা সময় আসবে হয়তো যা আছে তা খুঁজেও পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গ কারণে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, এখন যারা কালো ধোয়ার শহরে পড়ালেখা করছেন (বিশেষত ছাত্রীরা) এমন আধুনিক হয়ে যাচ্ছেন গ্রামে আসলে বা কোন সামাজিক পার্বনে তাদেরকে সামাজিকতা দেখায় না। বিশেষত তাদের পোশাক আসাকে। বেধর্মী বা বি-জাতিদের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য পুরুষরাও এর দায় অনেকাংশ এড়াতে পারে না। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি রকম এবং আমি কোন সমাজে বাস করছি (?) আমি একটি বিষয়ে খুব আতংকিত এবং আশংকায় থাকি আগামীতে আমাদের জাতীয় পোশাক থাকবে কিনা। কেননা বর্তমান সময়ে অধিকাংশ নারী নিজের পরনের পিনন পর্যন্ত বুনতে জানেন না। আর অন্য চার পোষাক (তঞ্চঙ্গ্যা ক্ষেত্রে) কিভাবে সম্ভব? অন্যদিকে পোশাকটা অনেকে বিকৃত করে অত্যাধুনিক নামে বৈচিত্র্যতা নষ্ট করা হচ্ছে। অবশ্য পুরুষদেরও ধুতি

ও লম্বা হাতা শার্ট (জামা) পরিধান করার জন্য চর্চা করা দরকার। মাতৃভাষাটাও অনেকটা এরকম হয়ে গেছে। এমনও ছাত্র-ছাত্রী আছে বাড়িতে বা গ্রামে গিয়ে অন্যভাষায় কথাবার্তা বলে (বিশেষত যারা রাঙ্গামাটিতে পড়ালেখা করছে)। অনেকে বলে শখে বলে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবেছি নিজের ভাষাকে যে অসম্মান করছি বা হারানোর পথ সুগম করে দিচ্ছি।

৩। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার না করাঃ

বিশ্বায়নের কালে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হলেও অন্যদিকে নেতিবাচক প্রভাবও কম নয়। সেই নেতিবাচক প্রভাবটা আমি মনে করি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুব মারাত্মক। বর্তমান সময়ে কিশোর কিশোরীদের হাতে অল্প বয়সে মোবাইল তুলে দেওয়া হচ্ছে। দরকার আছে, তবে সময়ানুযায়ী আর আমাদের অভিভাবকরা তা কখনো নজরদারী করেছে যে, ব্যবহারকারী সঠিকভাবে মোবাইল ব্যবহার করছে কিনা? আমি এ বিষয় একারণে তুলে ধরছি বর্তমান সময়ে মোবাইল প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে মোটামুটি বিশাল একটা অংশ অকালে শিক্ষা জীবন হতে ঝড়ে যাচ্ছে। আর ঝড়ে না গেলেও থাকছে কোন রকমে ঝুলিয়ে। অল্প সময়ে মোবাইল বা প্রযুক্তি হাতে তুলে দেওয়া মানে তাকে অগ্নিগর্ভের অভিমুখে ঠেলে দেওয়ার সমান। তাই আমি বলবো যারা কম বয়সে এসব চিন্তা করছেন, তারা খুব সাবধান এবং একটু ভাবুন যে, আমি কী করছি বা করতে চাচ্ছি। মানুষ খুব আবেগী, আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক অঘটন ঘটায়। তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন পত্রিকার পাতা। এমনকি আত্মহত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না। যার ফলে অনেকে বাবা-মার স্বপ্ন ভেঙ্গে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে। বুঝে বা না-বুঝে হোক ওরা ফর্নোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। আর এসব হচ্ছে বেশীর ভাগ (১৪-২০) বছর বয়সের ব্যক্তিদের দ্বারা, সুতরাং যারা যুগটাকে তাল মেলানোর নামে এই রকম চিন্তা করেন আমি বলবো যুগ পরিবর্তন নামে কম বয়সের বা শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর হাতে মোবাইল বা প্রযুক্তি তুলে দেওয়া নয়। এবং পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মাল্টিমিডিয়া বা যেকোন মোবাইল বা প্রযুক্তি তুলে দেবো কেন? এটা কোন ভালো সমাধান নয়। বরঞ্চ আত্মঘাতি।

সুতরাং আমাদের এসব বিষয় নিয়ে খুব বেশী ভাবতে হবে। অন্যথায় আমাদের সমাজ ও জাতি নোংরামি আর আবর্জনা স্তুপে পরিণত হবে। আমরা চায়না মাদকাসক্ত ছেলে-মেয়ের হাতে পিতা-মাতা বা পরিবারের কেউ খুন হয়ে সোনার সংসার নষ্ট হয়ে যাক। জীবন খুব মূল্যবান। আজকের তরুণ সমাজ-ই তো দেশের জাতির ভবিষ্যত। জীবনে হতাশা আসে, নানা সমস্যাও জর্জরিত। হতাশায় মাদক কোন সমাধান হতে পারে না। হতাশা মুক্তির উপায়ও নয়। মাদক আমার আর আপনার পরিবারের জীবনকে করে তুলতে পারে দুর্বিষহ, এমনকি ডেকে আনতে পারে মৃত্যু! প্রথম আলোর এক জরিপ মতে, দেশের প্রায় ৭০ লাখ লোক মাদকে আসক্ত (অধিকাংশই তরুণ-তরুণী) এতে অবশ্য আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা বাদ যায়নি। এ রকম অবস্থা যদি চলে তাহলে আগামী ১০

বৎসর পর সমাজের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। নেশার জগতে আমাদের বর্তমান তরুণ ও যুবসমাজ কে কতটা অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে তা ভেবেও কূল পাওয়া যাবে না। কথাটি তিক্ত হলেও বাস্তব যে, মরণ ব্যাধি নেশায় আসক্ত হওয়ায় প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে বন্ধুত্বের নামে অবাধে মেলামেশা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়া। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা উচ্চ বিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের পিতা মাতারা খুব স্বাভাবিক ভাবেন। কিন্তু তারা কখনো খোঁজ খবর নেন কিনা যে, তাদের সন্তান বন্ধুত্বের নামে কার সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে বা কি করছে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারেন তখন প্রবাল বা ঐশির মতো সব শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের তরুণ সমাজের অনেক ছেলে-মেয়েরা বন্ধুত্বের বা প্রেমের নামে অবাধ-যৌনাচার বা দৈহিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ছে। তাই এসব বিষয়ে অভিভাবকদের আরো সচেতন ও সতর্ক হতে হবে এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা প্রয়োজন। সেই ছেলে হোক বা মেয়ে হোক এবং সে যেখানে পড়ুক না কেন সে কোথায় যায়, কার সাথে ঘনিষ্ঠতা, কখন বাসায় ফিরে, মোবাইলে বা কম্পিউটারে ব্যবহারের নামে সে কোন ফর্নোগ্রাফি চিত্র দেখে কিনা, তার বন্ধুরা কি ধরনের এসব খুব সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের সমাজ হতে হবে মাদক মুক্ত তরুণ সমাজ। ছাত্র সমাজ হবে সচেতন, যুক্তিবাদী ও সুশিক্ষিত। আর জাতি হবে আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় যেখানে কোন হিংসা বা রেষারেষি এবং ভ্রাতৃত্ব সংঘাত থাকবে না।

লেখক ঃ ছাত্র, বিবিএ (হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ), রাঙামাটি সরকারি কলেজ, রাঙামাটি।

শুভদৃষ্টি

- প্রমিলা তনচংগ্যা

কাঁদে চোখ, বাঁধে মন। তবু কোনো না কোন সময় তো বলতেই হবে এই সব কথোপকথন। বাস্তবতার নিয়তিতে সত্য-মিথ্যার জাল বুনছে সবাই। সহজ-সরল জীবনটা অনেক সময় বাস্তবতাকে ঘিরে খুব কঠিন হয়ে দাড়ায়। এই কঠিন বাস্তবতার মাঝে নিজের পরিচয় নিজের অধিকার আদায়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিরব হয়ে গেছেন অনেকের জীবন। তবু আজো কী প্রতিবাদের সুফল আমরা পেয়েছি? নাকি শুধু প্রতিঘাট পেয়ে চলেছি? চোখ কাঁদলে বুঝে সবাই, কিন্তু মন বা হৃদয় কাঁদলে কেউ সহজে বুঝতে পারেনা। মানুষ মানুষকে আশ্বাস দেয়, আবার মানুষেরাই করে ছলনা। তবু মানতে না চাইলেও মানতে হবে, এটাই আমাদের সমাজ ব্যবস্তা ও বাস্তবতা। হয়তো এটাই নিয়তি। দিনের আলো আছে বলে রাতের অন্ধকারকে উপলব্ধি করতে পারি। দুঃখ আছে বলে সুখ কী তা অনুভব করতে পারি। পরাজয় ঘটে বলে, জয়ের উল্লাস উপভোগ করতে পারি। এই যে হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যা, আশা-নিরাশা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্রিয়া ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে বলে আমরা প্রতিটা বিষয় সহজে উপলব্ধি করি বা বুঝতে পারি। ঠিক তদ্রুপ মানুষের নারী-পুরুষের পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কেন একে অপরের নির্ভরশীল? তার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব। নারীদেরকে ঘরের কোণে বন্ধী রেখে পুরুষের দ্বারা সব কিছু কাজ করা সম্ভব নয়। তাই যে কোন কাজে পুরুষের সহযোগিতা করতে নারী সমাজকেও বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসতে হবে। জাতি-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে মানুষ মানুষের জন্য এই মন-মানসিকতা তৈরি করে। আমাদের দেশে বড় বড় রাজনৈতিক দল যেমন রয়েছে। তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল ভেদেও সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন রকম সামাজিক দল রয়েছে। এসব রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন ধরণের গ্রুপে স্থান, কাল স্রোতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বহু নেতা-নেত্রীও গড়ে উঠছে। উনাদের মুখে আমরা অনেক সুন্দর ভাষা ও আশ্বাসের বাণী শুনতে পায়। আমরা উনাদের বক্তৃতা শুনে বিশ্বাস করে জোড়ে জোড়ে হাত তালি দিই আর আশার আলোর শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু সময়ে বলে দেয় যে, কী করেছে আর কী করা দরকার আমাদের নারী সমাজকেও অনেক আশ্বাসের বাণী দিতে দেখা যায় যে নারীরাও মানুষ। নারীরাও আজকের বিশ্বে আর পিছিয়ে নেয়। আমরা তোমাদের সমান অধিকার প্রদান করছি। তোমরা এগিয়ে যাও। কিন্তু কথা আর বাস্তবতা যে কতটা পার্থক্য তা আমরা যখন বাইরে বের হই তা হারে হারে টেরপাই আর উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সমাজ ও জাতি আমাদের চারপাশে পরিবেশ আসলে কতটুকু নারীদেরকে সম্মান ও সমান অধিকার প্রদান করতে পেরেছে। আসলে কী সত্যি পেরেছে? আপনারাই স্বজ্ঞানে সুদৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখুন।

কন্যা শিশু জন্মঃ

আমাদের সমাজের চারপাশে এখনও এমন মানুষ আছেন যারা কন্যা শিশু জন্ম নিয়েছে শুনলে খুশি নন। অনেক বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যরা পুত্র সন্তান কামনা

করেন। এছাড়াও পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম দিলে জন্মদাতা মাতাকে দায়ী করা হয়। যদিও এই ক্ষেত্রে নারীদের কোন দোষ নেই। তবু অজ্ঞতার কারণে নারীদেরকে এমন কিছু মাথা পেতে শুনতে হয়। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক। আমাদের তনচংগ্যা সমাজে পিতা-মাতার সম্পত্তিপুত্র সন্তানরাই উত্তরাধিকারী হয় এবং মৃত্যু আগ পর্যন্ত পুত্র সন্তানরা বাবা-মায়ের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তনচংগ্যা সম্প্রদায়ে কন্যা সন্তানদের পিতা-মাতার কোন সম্পত্তি ভাগ দেওয়া হয় না বা দিতে হয় না। তবে যদি কোন পরিবার তার কন্যা বা বোনের উপর খুশি মনে কিছু দিতে চান বা দেন, তখনি কন্যা সন্তানরা পিতার-সম্পত্তি কিছু অংশ ভাগিদার হলেও হতে পারেন। যদি কন্যা সন্তানটি নিতে কোন আপত্তি না করেন। এসব কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে পিতা-মাতারা পুত্র সন্তান বেশি লাভ করতে চান। পুত্র সন্তান লাভ করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় অনেক কন্যা সন্তান জন্ম হয়। ফলে পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক বাবা-মা সন্তানদের প্রতি সঠিক ভরণ-পোষন, নানান প্রয়োজন মেটাতে ও গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। তখন সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কন্যা শিশুদের নানান দিক দিয়ে অবহেলা করা হয়।

ভাবুন তো! শিশু যখন জন্ম হয় তখন সেকি জানে? যে তাকে নিয়ে কী জল্পনা-কল্পনা করা হচ্ছে? সে তো অবুঝ শিশু। সে জানে না যে কোন পিতা-মাতার কি রকম স্নেহের সন্তান হিসেবে অধিকার লাভ করেছে। যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয় বা বেড়ে উঠে তখন তার বাবা-মা ও পরিবার সদস্য সবকিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আর তখনই সে আস্তে আস্তে তার মা-বাবা, পরিবার পরিবেশ সবকিছুর সাথে পরিচিত হতে শুরু করে বা পরিচিত হয়। সে তখন বিশ্বাস করতে শুরু করে। যে কেউ বা বাবা-মা তার সন্তানকে যদি আম গাছকে জাম গাছ বলে পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে শিশুটি তাই বিশ্বাস করতে শিখবে। কারণ শিশু অবস্থায় তারা শুধু জানার জন্য শিখে। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার বুদ্ধি বা জ্ঞান তাদের মধ্যে তখনও তেমন কোন সজ্ঞান উৎপত্তি হয় না। বাবা-মা, পরিবার, ও চারপাশের পরিবেশ ভাল-মন্দ যা শিক্ষা দেন বা আচরণ করেন শিশুরা তাই মনে ধারণ করেন। মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টি হয় পরিবেশ ও পরিবার থেকে। সুতরাং কন্যা শিশু জন্ম হলেও তাকে যদি সঠিক ও সুশিক্ষায় দেওয়া হয় বা দিতে পারা যায় তবে কন্যা সন্তানরাও ছেলেদের মত বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সে সেবা-যত্ন ও ভরণ-পোষণের সত্যিকারের সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। তাই পুত্র-কন্যা যে শিশু জন্ম হোক না কেন তাকে সঠিক পরিচর্যা, স্নেহ, আদর, সুযোগ-সুবিধা ও সুশিক্ষা প্রদান করা এবং সমান ও সুদৃষ্টিতে দেখা প্রত্যেক আদর্শ বাবা-মায়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব নয় কী?

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ঃ

শিক্ষা কী? নারী শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমে এই প্রশ্নে উত্তর জানতে হবে। শিক্ষা হচ্ছে এমন জিনিস যা মানুষের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকা জ্ঞানকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে, অবুঝকে বুঝতে সাহায্য

করে। শিক্ষার জন্যই মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব গড়ে তোলেছে। শিক্ষার কারণে মানুষ নিজেই নিজের ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে। মানুষ যদি বাইরের জগৎ থেকে দেখে বা পড়ে কিছু না বুঝতেন বা না শিখত তারা যদি অজ্ঞান থাকত তাহলে বর্তমান বিশ্বে আজ এত কিছু সৃষ্টি হতনা। তাই বাংলাদেশ সরকার ছেলেদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার উপরও জোর দিয়েছেন। এজন্য তো প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই প্রদান করা হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে নারীদের পড়ালেখা করার সুযোগ-সুবিধাও করে দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু এসব সুযোগ-সুবিধা কী সবাই পাচ্ছে? যারা তৃণমূল গ্রাম পর্যায়ে আছেন তাদের পরিবার ও বাবা-মায়েরা তো এখনও সচেতন নয়। এখনো পার্বত্য অঞ্চলে বই কি জিনিস, কলম কিভাবে ধরতে হয় তা জানে না। যেখানে ছেলেদের পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ নেই সেখানে নারীশিক্ষা তো অনেক দূরে। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক দিক ছাড়াও নেতিবাচক অনেক কিছু রয়েছে। যা আমরা সাধারণ হিসেবে ভেবে নিই। অনেকের কাছে কথাটি অযুক্তি মনে হলেও এটাই সত্য যে অনেক বাবা-মা মেয়ে সন্তানের চাইতে ছেলে সন্তানদের লেখা-পড়া ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি গুরুত্বরোপ করেন। ছেলে সন্তান কোন কিছু আবদার করলে যা সহজে পাই, মেয়ে সন্তানটি পাই না। ছেলে সন্তানকে যতটুকু আদর ও যত্ন পরিচর্যা পায়, মেয়ে সন্তানরা সেভাবে অনেকেই পায়না। উদাহরণ স্বরূপঃ স্কুল ছুটির পর ছেলেরা যখন হাতে বল আর ব্যাট নিয়ে মাঠে খেলতে যায়। তখন মেয়েরা কালো হাড়ি-পাতিল নিয়ে নদীতে মাজতে যায়। ছেলেরা যখন বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে, তখন মেয়েরা রান্না ঘরে ঢুকে যায়। ছেলেরা যখন পড়তে বসে, তখন মেয়েরা মাকে সাহায্য করে রান্নার কাজে। এস.এস.সি পাস করার পর ছেলেটাকে যখন ভাল কলেজে ভর্তি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন মেয়েটাকে পাশে কোন কলেজে ভর্তি করাবে কি করাবে না তা নিয়ে তর্ক হয়। আর যখন এইচ.এস.সি পাস করে ছেলেটাকে যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে শহরে পাঠানো হয়, তখন মেয়েটাকে বাবা-মায়ের সাথে কৃষি কাজে সাহায্য করার জন্য মাঠে-পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এত কিছু পরেও অনেক মেয়ে প্রবল মেধা থাকা সত্বেও শুধু মাত্র আর্থিক ও পারিবারিক সহযোগীতার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে পারে না। আর অনেকের তো কলেজে পড়াকালীন বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় আমাদের মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম। যে সময় তাকে নিজের জীবন গড়ার কথা, সেই সময়ে তাকে অনেকের জীবনে এভাবে বিষাদ নেমে আসে। এছাড়াও অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু খারাপ ঘটনার উপর নির্ভর করে বাবা-মায়েরা মেয়েদের ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরে বা দূরে কোথাও পড়ালেখার জন্য পাঠাতে চাইনা। এটা স্বাভাবিক যে প্রত্যেক বাবা-মা চাই সন্তানের ভাল হোক। নিজের সন্তান খারাপ পরিবেশে গিয়ে বা খারাপ লোক বা বন্ধুর সাথে মিশে খারাপ পথে ধাবিত হোক এটা কোন বাবা-মা কখনো চাই না। অতীত আর বর্তমানে ঘটে যাওয়া খারাপ বার্তা শুনলে যে কারোর ভয় হয়।

তাই বলে তো জীবনের চলার গতি থেমে থাকার নয়। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে বাস্তবতার সাথে লড়াই করে, অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ সন্তানদের দিতে হবে। ভয়ে বুকে আগলে রাখলে সেই সন্তান কখনো সাহসী হয়ে উঠবে না। যে যত বেশি কঠিন বাধার সম্মুখীন হবে, সে তত বেশি সাহসী এবং তা সহজে চিনতে ও উপলব্ধি করতে পারবে। আমার মতে বাবা-মায়েরা কখনই নিজের সন্তানদের স্বাধীনতা দেয় না, যখন তারা তাদের ছেলে বা মেয়ের উপর নিজেদের দীর্ঘ সময় প্রদান করা আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, শিক্ষা, উপদেশ ও পরামর্শ ইত্যাদির উপর পূর্ণবিশ্বাস থাকে না। নিজের সন্তানদের বা মেয়ের উপর যদি নিজেদের শিক্ষা ও ভালোবাসা প্রদানে পূর্ণ বিশ্বাস থাকত তাহলে কখনো অন্যের ঘটে যাওয়া খারাপ বিষয়গুলো দেখিয়ে দিয়ে নিজের মেয়ের বা সন্তানের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াত না। আর মেয়েদের ও এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত না। আমাদের তঞ্চঙ্গ্যাদের একটি প্রবাদ আছে "বন বাঘে ন-খাদে, মন বাঘে আগে খায়।" অর্থাৎ বনের বাঘ না খেতে, মনের বাঘ আগে খাই। তবে প্রত্যেক বাবা-মা'র জানা উচিত তাদের সন্তানরা কী চাই? কেন চাই? বন্ধুর মত সন্তানদের সাথে ভাব করে বা সম্পর্ক তৈরি করে, ভাল-মন্দ সবকিছু গোছিয়ে বুঝিয়ে বলা। আর আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও এটা জানা উচিত আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের কাছ থেকে কী আশা করে? আমাদের নিয়ে তাদের কী স্বপ্ন? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি সব বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে থাকলে আমার মনে হয় না অশুভ কিছু হবে।

উপরের উল্লেখিত আলোচনার উপর নির্ভর করে "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফোরাম" ও সহযোগিতায় "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা" শুধু "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফোরাম" কর্তৃক আয়োজিত প্রতি বছর এক বার করে পিকনিক, ক্যালেন্ডার ও বিভিন্ন ফোরামে, সেমিনারে, সমাবেশে যোগদান করলে হবে না। স্টুডেন্ট ফোরাম যখন গঠন করা হয়েছে অবশ্যই তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টদের মঙ্গলার্থে করা হয়েছে। তাই একটা অনুরোধ এমন কিছু করুন যা আজীবন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভাল কিছু বয়ে নিয়ে আসে। আপনাদের অনেক কিছু করার আছে, যেটা পরিবার ও সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই এই সব ফোরাম, দল, গ্রুপ ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। শুধু পদবী বা আসন পেয়ে স্থান দখল করে থাকলে চলবে না। পদবীর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু যথার্থভাবে পালন করা চাই। যদি দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে সেখান থেকে সরে যাওয়া জ্ঞানী মানুষের কাজ নয় কী?

ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে ঃ

ধর্ম, ধর্মের বাণী ও ধর্ম প্রচার আমাদের পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানুষের চেতনাকে ভাল পথে পরিচালনা করার সুশিক্ষা দিয়ে থাকেন। যে কোন ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেশের উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য বিশেষ অবদান রাখেন। যে মানুষগুলোর পুস্তক শিক্ষা নেই বা যারা পড়ালেখা করেননি সমাজের এসব মানুষ বেশির ভাগ কিন্তু ধর্ম শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে আমাদের সমাজের মুরব্বিগণ

ও বয়স্ক লোকেরা ধর্মীয় গুরুর কথা শুনে তা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ধর্মীয় গুরু বা ভিক্ষুরা ধর্মের বাণী প্রচার করতে গিয়ে খারাপ বাণী প্রচার করে থাকেন। যা বলা উনাদেরকে সাজে না বা মানাই না।

উদাহরণ স্বরূপ- কিছু কিছু ভিক্ষু তাদের ধর্মের বাণীতে উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মের উদাহরণ দিতে গিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে, যদিও অজান্তে অনেক সময় শুনা যায় নারীদেরকে হিংসা করে, খারাপ মন্তব্য করে পুরুষদেরকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেন অথবা পুরুষদের সর্ম্পকে খারাপ মন্তব্য করে নারীদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তবে পুরুষের চাইতে নারীদের প্রতি একটু বেশি খারাপ মন্তব্য করে থাকেন অনেকেই। এমন কী এই রকম নানান পুস্তকও বের হয়েছে। যার ফলে আমাদের সমাজের মুরব্বিগণ নারীদেরকে পাপী, পাপের ফলে নারী জন্ম, যে পরিবারে নারী শিশু বেশী জন্ম হয় সেই পরিবারের বাবা-মায়ের নির্বাণ লাভের অর্জনের পথ অর্ধেক বন্ধ হয়, নারীদের কারণে ধর্মের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, নারীদের জন্য সমাজে ও পরিবারে নানান অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আরো কত কিছুই না কারনে অকারণে অপবাদ শুনতে হয় নারীদের এসব মন্তব্য করে আমাদের নারী ও কন্যা সন্তানদের নানান অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে তাদের মনেও অপরাধ বোধ জন্মিয়ে দেয়া হচ্ছে। যার ফলে আমাদের সমাজের মায়েরা সেটাই বিশ্বাস করে ফেলেন। ফলে নারী সন্তানরা নানান কারণে অকারণে দোষী এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়। এভাবে তারা সমাজ ও পরিবার থেকে নানান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদেরকে এইসব দোষ বা অপরাধের কথা বলে তাদের মন, চেতনা ও জ্ঞানকে হীন করা হয়। তাদেরকে আত্মসম্মানে বা আত্মবোধে আঘাত করতে বাধ্য করে। এদিকে নারীরাও তাই মেনে নিয়ে নিজেদেরকে দুর্বল, দোষী, পাপী, দায়ী, অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের করার কিছু নেই, এমনটাই মনে করে নিজেদেরকে আরো নিম্ন পথে ধাবিত করছে। অনেকেই অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে বন্ধী করে রাখার মন-মানসিকতা গড়ে তোলেন।

তবে এই কথাটি আমাদের প্রত্যেকের জানা আছে যে, আমরা প্রত্যেকে আমাদের মায়ের গর্ভে ধারণ করেছি। আমাদের মা আমাদের লালন-পালন করেছেন বলেই আমরা আজ পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ অনেক কিছু অনুভব ও উপভোগ করতে পারছি। মায়ের আদর স্নেহের যত্নে ও বাবার দায়িত্ব কর্তব্যের ফলে আমরা আজ বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে নিজেদের কর্মের গুণে পরিচিত। তাই আমরা আজ কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ সাহিত্যিক, কেউ ভিক্ষু, কেউ গবেষক ইত্যাদি হতে পেরেছি আর আগামীতেও অনেকে অনেক কিছু হবে। তাহলে আপনারাই বলুন নিজের জন্মদাতা মা কী পাপী, দোষী? নারী হয়ে জন্ম নেওয়াটাই যদি পাপের ও অলক্ষণের হয় বা অপরাধের হয় তাহলে নিজের মা ও তো একজন নারী। মা যদি পাপী হয়, প্রত্যেক নারী যদি অলক্ষিনী,

দোষী বা অপরাধী হয়, তাহলে প্রত্যেক নারীর বা মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া প্রতিটি সন্তানই পাপী। কিন্তু যখন কোন সন্তান পৃথিবীতে জন্ম নেয় তখন তার মন তো কোন পাপ থাকে না। জন্মের পরে মানুষ কেউ ভাল বা পবিত্র পথে ধাবিত হয় আর কেউ খারাপ পথে বা পাপের পথে পরিচালিত হয়। সেই ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। যে যেমন কর্ম করবে, সে অবশ্যই তেমনই সুফল অথবা কুফল ভোগ করবে। তাই আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকে নিষ্পাপ হয়ে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু গড়ে ওঠার সময় পরিবেশ, পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণী-জাতির বিভিন্ন তারতম্য বা পার্থক্যের কারণে কেউ এগিয়ে গিয়েছে আর কেউ পিছিয়ে আছে।

নারীদেরকে অপরাধী, দোষী, পাপী, অলক্ষিণী, অপয়া ইত্যাদি খারাপ কিছু প্রমাণ করে নিজেদের ধর্ম, সমাজ ও জাতির উন্নয়ন কখনো পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। যারা হীন চিন্তা ধারা করেন, যাদের জ্ঞান স্বল্প, যাদের মনে নারীদের প্রতি ঘৃণা রয়েছে, যারা প্রকৃত বিনয়ী, ন্যায় ধর্ম অর্জন করতে পারেননি উনারাই এসব মন্তব্য করে থাকেন। নিজেদেরকে উপরে উঠানোর জন্য নিজের অপরাধকে চাপা দেওয়ার জন্য এবং সর্বপুরি নিজেদের দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখার জন্য তারাই অনেক হিংসা করে, নিজেদেরকে সম্মানের স্থানে বসাতে চান। তাই বলে এই নয় যে আমি মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলার জন্য বলছি। যদি এমনটাই কারো ধারণা হয় তাহলে সেটা ভুল। আমি শুধু আমাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-ধারা ও আমাদের এই দৃষ্টি ভঙ্গিগুলোকে পরিবর্তন করে নারী সমাজকেও সম্মান ও শুভদৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি মাত্র। তাই আমাদের ধর্মের প্রচার ও ধর্মের বাণী হিংসাযুক্ত না হয়ে, অবশ্যই সত্য, ন্যায়, যুক্তি, পবিত্র ও ধর্মের রসে পরিপূর্ণ হতে হবে।

নারীদের অবস্থান ঃ

বর্তমান বিশ্বে এখন নারীদের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হলেও আমাদের আদিবাসী সমাজে বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে যাদের বসবাস এসব সমাজে নারীদের অবস্থান এখনো করুন কোন কোন অঞ্চলে নেই কোন সচেতনতা, নেই কোন অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী, নেই কোন উন্নয়ন ও শিক্ষা। আমাদের আদিবাসী সমাজে এখনো প্রাচীন কালের মত জীবন ধারার মানুষ খুঁজলে পাওয়া যায়। বর্তমান শহরাঞ্চল মানুষের সাথে উনাদের যখন তুলনা করা হবে, তখন আমরা অনেক পার্থক্য বা দূরত্ব খোঁজে পাব। যেখানে পরিবেশের এত দূরত্ব আর মানুষের জীবন ধারা এত পার্থক্য যেখানে ছেলেদের অবস্থান পর্যন্ত সচ্ছল নয়, সেখানে নারীদের অবস্থান তো আরো খারাপ। প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের অবস্থান না হয় এমন। কিন্তু যারা গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বসবাস করেন উনাদের অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের চেয়ে উন্নত হলেও সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এদের কম যন্ত্রনা দেয় না। আমরা কোন না কোন সমাজের মধ্যে অবস্থান করি। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সব সমাজের নারীদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই আমাদের সমাজের ক্ষেত্রেও এটা নতুন কোন বিষয় নয়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মস্থল, অনুষ্ঠান, সভা-সমাবেশ ও বিভিন্ন মিটিং এ নারীদের অংশ গ্রহণ স্বল্পতাই বড় উদাহরণ।

পরিবার হচ্ছে সমাজ গঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। আর আমাদের সমাজের পরিবার প্রধান হচ্ছে পুরুষ। এদিকে নারীদের চলার পথে প্রথম বাধা হচ্ছে তার পরিবার। পরিবারের পরেই আছে অন্যকিছু। কারণ মেয়েরা যখন বাড়িতে থাকেন তখন পিতার অধীন আর যখন বিয়ে হয় তখন স্বামীর অধীন। সুতরাং পরিবার কেউ যদি মেয়েদের ও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রকাশ না করেন, তবে নারীরা কিভাবে পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে অবাধ্য হয়ে এই সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বা যোগদান করবেন? পরিবার ও সমাজে যদি নারীদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া না হয় অর্থ্যাৎ শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, যন্ত্রনা ও অপবাদ দেয়া হয়, তবে নারী সমাজ কী এসব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? যদি না পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন এদের পাশে না দাঁড়াই। তবে আদৌ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সংসারে প্রায় দেখা যায়-

(ক) মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নিজের স্ত্রীকে মারধর করা হয়।

(খ) অন্য কারোর সাথে ঝগড়া বা ঝামেলা হলে নিজের স্ত্রীর উপর সব ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলা হয়।

(গ) সারা দিন বাড়িতে বা বাইরে পরিশ্রম করার পর তবু সামান্য কিছুর জন্য স্বামী বাড়ি আসলে নিষ্ঠুর ভাবে অনেক স্ত্রীকে গালি-গালাস শুনতে হয়।

(ঘ) যারা চাকুরী করেন অফিস থেকে এসে সব বাড়ির কাজ অনেক নারীর একাই সামাল দিতে হয়। যখন কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে মেয়েদের রান্না-বান্না করতে সাহায্য করেন তখন অনেক পুরুষ তা নিয়ে হাসা-হাসি করেন। এতে ছেলেরা লজ্জায় আর মেয়েদের কাজে সাহায্য করেন না।

(ঙ) অনেক সময় দেখা যায় ছেলেরা অন্যদের কাছ থেকে মন্দ বাক্য শুনার পর সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে নিজের স্ত্রী, বোন বা মেয়ের উপর অপবাদ দিয়ে এদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

(চ) সমাজের ভিতরে বা বাহিরে যদি কোন কারণে অঘটন ঘটে সেখানে কোনক্রমে একজন নারী জড়িত থাকলে, তবে বেশির ভাগ অপরাধের অপবাদ অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে দেওয়া হয়। তখন সেই নারী সমাজের দৃষ্টিতে খারাপ বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) বিভিন্ন কর্মস্থলে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিটি পদে পদে হেয় করা হয়।

(জ) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সে কাজটা নিজেদের করার ইচ্ছা নেই, অনেক সময় সেই কাজগুলো স্ত্রী বা নারীদেরকে দিয়ে জোর করে করানো হয়। যদি খারাপ কিছু হয় তখন ভুলের মাসুল নারীদেরকে দিতে হয়। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা করলে ভাল হবে জেনেও তা তাদের করতে দেয়া হয় না ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত কন্যা শিশু জন্ম, নারী শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের উদাহরণ তো আছেই। এসব ছাড়াও আরো অনেক কিছু কারণ রয়েছে যা বর্ণনা বা উদাহরণ দিলে খাতা পুরিয়ে যাবে তবু শেষ হবে না। প্রায় নারীদের জীবনে যদি এমনটাই হয়, তবে কোথায় এদের ভবিষ্যৎ আর পরিতৃপ্তি? এমন সমস্যা যদি মুরব্বিদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন

মুরব্বিরা যদি প্রায় অনেকে বলেন তোমরা মেয়ে মানুষ দুর্বল, অপয়া, অবলা, অধীন, তোমরা চুপ করে সহ্য করে ধৈর্য ধরে থাকো। পুরুষ মানুষের গায়ে অনেক জোর, এরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। এসব আশা করা যায় না তবু সমাজের কাছ থেকে যদি এসব শান্তনার বাণী শুনতে হয়। তাহলে সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যার ফলে এভাবে অনেক নারী সংসারে আবদ্ধ হয়ে এমন সমাজে বন্ধী হয়ে এগোতেও পারেননি আর পিছাতেও পারেননি। বছরের পর বছর দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রনা ভোগ করে সহ্য করতে করতে অকাল বা অপরিণত বয়সে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে অনেকের।

নারীরা হচ্ছে পুরুষের সহযোগী। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর সহধর্মিনী। পুরুষের প্রতি নারীদের সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে নারীদের দুর্বলতা মনে করবেন না। স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভরসা করে বলেই মুখ বুঝে এরা অনেকেই সব কষ্ট বা দুঃখ সহ্য করে থাকেন। এদের এই নিরবতাকে বা কষ্ট সহ্য করাকে পাপের কর্মের ফলে এসব ভাগ করতে হচ্ছে বলেই অযথা দোষারোপ করবেন না। এতে পুরুষের হীন মন-মানসিকতার পরিচয় মেলে। দেশের মধ্যে নারীদের রক্ষার্থে অনেক আইন তৈরি হয়েছে। যেমন :

সংবিধানে যা লেখা আছে-

ক) অনুচ্ছেদ ২৮ রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকলক্ষেত্রে নারী পুরুষর সমান অধিকার রয়েছে।
খ) ১০নং অনুচ্ছেদ- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
গ) ২৭নং ধারা সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
ঘ) ২৮ (১) নং ধারা কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদান করবে না।
ঙ) ২৮ (২) নং ধারা-রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।
চ) ২৮ (৩) নং ধারা কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোন রূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।
ছ) ২৮ (৪) নং ধারা- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা-নাগরিকদের কোন অনুগ্রহে অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রীকে নিবৃত্ত করবে না।

আইনী পদক্ষেপঃ

ক) বিবাহ ও তালাক নিবন্ধী করণ আইন- ১৯৭৫ (সংশোধিত)
খ) যৌতুক নিরোধ-আইন- ১৯৮০
গ) বাল্য বিবাহ্য নিরোধ-আইন- ১৯২৯
ঘ) নারী নির্যাতন ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০
এছাড়াও আরো অন্যান্য বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় নারী নীতি ২০১১ নারীদের যাবতীয় উন্নয়নের জন্য জাতীয় নারী নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। যার উদ্দেশ্য খুব মহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এসব সম্পর্কে

আমাদের নারীরা কতটুকু সচেতন? কিন্তু আইনের সহযোগীতা নিলেও তো অনেক টাকা ও জনবল দরকার। এসব সুযোগ সুবিধা কত জনে বা পাচ্ছে? তাই তো আমাদের আদিবাসী কত মেয়ে নির্যাতিত হয়ে নিরব করে চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকেনা। হয়তো বিভিন্ন ফোরাম ও ছাত্র সংগঠন একবার, দুইবার সমাবেশ করা হয়। পরে পুলিশ ও আইন আমরা বিষয়টি দেখছি বা দেখব বলে লাল ফিতার ফাইলের মত বছরের পর বছর ফেলে রাখা হয়। উনাদের ও বা কী দোষ? দেশের বড় বড় সমস্যা সমাধান করতে সারা বছর লেগে যায় অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই এই ছোট ছোট সমস্যাগুলো আইন আদালতের কাছে কোন কিছুই নয়। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য এগুলো অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা এসব সমস্যাগুলোকে ছোট মনে করি বলে তো আমাদের সমাজে নানান সমস্যা ও বড় বড় ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান আমরা কেউ সহজে দিতে পারিনা। তাই আমাদের এই ব্যাপারে সমাজের মেয়েদের ও সচেতন ও সর্তকভাবে চলাফেরা করা দরকার। পরিবার ও সমাজের মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সবাইকে হিংসাযুক্ত না হয়ে হিংসা মুক্ত হতে হবে। অপরাধীকে অপরাধী না বলে অপরাধ প্রবনতা কেমন করে কমানো যায় সবাইকে সেই চেষ্টাই করতে হবে।

পরিশেষে ঃ আমাদের বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিজের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বাবা-মায়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে সন্তানদের ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন উপহার দেয়ার। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও সমাজ ও পরিবার অর্থ্যাৎ নিজের বাবা-মাকে নিজের মত করে অনেক সময় তৈরি করে নিতে হয়। কারণ আমরা যা ভাল মনে করি, তা হয়তো উনারা বুঝে উঠতে পারেন না। তাই বড় হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের মত করে বাবা-মায়েদের তৈরি করে নেওয়া আমাদের সন্তানদের কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক মানুষের বুঝার বা ভাল-মন্দ বিচার করার বোধ আছে কিন্তু সবার সক্ষমতা এক নয়।

আমার এই লেখাটি অনেকের ভাল অথবা মন্দ লাগতেই পারে। তবে এই লেখাটি কাউকে উদ্দেশ্য করে বা বিরোধিতা করে নয়। শুধু একটাই উদ্দেশ্য নারীদেরকেও মানুষ হিসেবে সম্মান ও শুভ দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ সবার কাছে। আমাদের নারী সমাজকেও বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান ও সম-অধিকার আদায়ের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। আবার সমান অধিকার নামে মেয়েদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কৌশলে অত্যাচার করলে তো আর চলবেনা। নারী-পুরুষের উভয় মিলনের ফলে বিশ্বের আজ কত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তাই নারীদেরকে বাদ দিয়ে বা নারীদেরকে পিছনে ফেলে রেখে একটি জাতির উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। তাই সবার জীবন সুস্থ, সুন্দর ও মঙ্গলময় হোক এই কামনা করে সবাইকে অনেক অনেক বিষুর শুভেচ্ছা।

লেখকঃ- ছাত্রী, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম, বি.এস.এস অনার্স, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

মানুষ দেবতা

শ্রী কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
সংগ্রহে : কর্মধন তন্‌চংগ্যা

প্রথম অঙ্ক
(প্রথম দৃশ্য)

স্থান = রাজগৃহনগর রাজসভা
(রাজা ব্রহ্মদত্ত রানী শীলবতী মন্ত্রী বলবাহন প্রবেশ)
ব্রহ্ম দত্ত ঃ বলমন্ত্রি বর রাজ্যের কুশল সংবাদ।
বলবাহন ঃ মহারাজ! রাজ্যে সর্বত্র কুশল।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রিবর! রাজ্যের প্রজাপুঞ্জগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করুক এটাই আমি কামনা করি।
শীলবতী ঃ মহারাজ ! পুত্রসম প্রজা পালন করা রাজ ধর্ম্ম।
ব্রহ্মদত্ত ঃ সত্য বটে রানি! আমি দশ রাজ ধর্ম্ম মতে সিংহাসনে বসে রাজ্যের প্রজাগণকে পালন করছি।
শীলবতী ঃ মহারাজ! দশ রাজ ধর্ম্ম বললে কি কি পালন করতে হয়।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন রানি! দান,শীল পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপ ঃ অবিরোধন, এই হলো দশ রাজ ধর্ম্মনীতি।
বলবাহন ঃ সত্য বটে মহারাজ! যাকে বলে রাজনীতি। রাজ্যে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন রাজ ভান্ডার খুলে দিয়ে অকাতরে দীন দুঃখী প্রজাদেরকে দান দক্ষিণা দিয়ে পালন করা, গরীব-কাঙ্গাল দিগকে দান করা রাজ ধর্ম্ম।
ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি মহাশয়! দানের পর শীল রক্ষা করতে হবে। তারপর পরিত্যাগ। রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গলার্থে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।
বলবাহন ঃ হ্যাঁ-মহারাজ! কি করলে প্রজাদের মঙ্গল হয় সেই চিন্তা করবে দেশের রাজা।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রিবর! দান, শীল, ত্যাগের পর অক্রোধ-অবিহিংসা-ক্ষান্তি দশ রাজ ধর্ম্মের নীতি।
বলবাহন ঃ মহারাজ রাজা যদি ক্রোধী হয় রাজ্যে হয় অশান্তি সৃষ্টি। ক্রোধ অগ্নি সমতুল। তাই অগ্নির দাহ জ্বলে পোড়ে ছাই করে দিয়ে তারপর নিভে যায়।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রিবর! অক্রোধ অবিহিংসা-ক্ষান্তি আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ ও অবিরোধন রাজধর্ম্ম নীতি অবশ্য পালনীয়।
বলবাহন ঃ মহারাজ! এই দশরাজ ধর্ম্ম পালন করে যদি রাজ্য শাসন করেন তাহলে পরলোকে নিশ্চয় স্বর্গে গতি হবেন।
ব্রহ্মদত্ত ঃ হ্যাঁ-বটে-মন্ত্রি মহাশয়! তবে রাজ্য শাসন করতে হলে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এই একটা রাজনীতি।

বলবাহন ঃ সত্য বটে মহারাজ! দুষ্টের দমন করা আর শিষ্টের পালন করে রাজ্য শাসন করা রাজার একান্ত কর্তব্য।

ব্রহ্মদত্ত ঃ তা-যদি না হয়- রাজ্যে-খুব বেশী চোর-ডাকাত-তস্কর বেড়ে যাবে, তখন রাজ্যের প্রজাগণ আর শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। রাজ্যময় অশান্তি এনে দেবে চোর-ডাকাত-তস্কর-দস্যুরা। আমি কঠোর হস্তে ঐ সকল দুষ্টের দমন করবো।

বলবাহন ঃ মহারাজ্য! রাজ্য শাসন করতে হলে চোর-তস্কর-দস্যু প্রভৃতি সকল দুষ্ট দিগকে দমন করে-রাজ্যে-শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে-প্রজাগণকে সুখে শান্তিতে পালন করে যেতে হবে।

ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রি বর! পাত্র মিত্র অমাত্য সকলকে জানিয়ে দাও- আমার সুশাসনে রাজ্যময় যেন শান্তি বিরাজ করে। কোথায়ও যেন চোর-ডাকাত-দুস্যু তস্করের উপদ্রব না হয় সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও সর্তক রাখতে হবে। চল আজ বিশ্রাম করিগে। (সকলে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান মচল গ্রাম- রাজ গৃহনগর

(একাকী মখবা প্রবেশ)

মখবা ঃ এ বিশালধরনী বুকে, এসেছি একা আমি, কোথা হতে এলাম- কোথায় চলে যাব, গতিহীন-সীমাহীন- মহাসিন্ধু নীরে- আমি, ভাসমান ভেলার মত। সংসার অলীক- অসার- সংসার বিষময়- শুধু হাহাকার। ছায়ারাজীসম- অনিত্য ও দুঃখময় জগত। শুধু-হা-হা-কার মাত্র।

মখবাঃ জন্মিয়ে মানব কুলে, বৃথা সময়-না করি ক্ষেপন, ক্ষনস্থায়ী দুর্লভ এই মানব জীবন- মানব ধর্ম্ম আমি করিব পালন, নতুবা বৃথা এই মানবজন্ম, আমি- মানুষ।

(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ প্রবেশ)

ও-রে মানুষ তুমি, মানুষ হয়ে চলনা রে ভবে।

মানব জন্ম অতি দুর্লভ- ওজনের চোখে- দেখ্‌তে হবে।

শোন ওগো মানব সুজন, মানব ধর্ম্ম- করছ পালন।

থাকতে তোমার জীবন যৌবন, মানব সেবা করে- যাবে। ঐ

(ধর্ম্মানন্দপ্রস্থান)

মখবা ঃ কে-তুমি মহাপুরুষ! দিয়ে গেলে মোরে- হিত উপদেশ-বানী। এবার আমি মানব সেবা করে যাবো। এই ক্ষন ভঙ্গুর মানব জীবনকে সার্থক করে তুল্‌বো। অধর্ম্মের পথে মানুষ চলে যাচ্ছে। রিপুর তাড়নায়-বশীভূত হয়ে- লোভ-দ্বোষ-মোহে পড়ে- মানুষের কাছে আজ- দয়া-মায়া-স্নেহ ভালবাসা- দিনের পরদিন কমে যাচ্ছে। কিন্তু! আমাকে মানুষ হয়ে জীবনের চলার পথে চল্‌তে হবে। যারা অধর্ম্মের পথে চলে যাচ্ছে তাদেরকে ধর্ম্মের পথে

ফিরায়ে আন্‌তে হবে। আমি লোকের কাছে বিলিয়ে দেবো মৈত্রী-প্রেম-ভালবাসা।
(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ প্রবেশ)
ও-ভাই-মানব ধর্ম্মের সুন্দরনীতি। পঞ্চশীল পালন করলে- স্বর্গে হবে তোমার গতি। প্রাণী হত্যা না করিবে,- পরদ্রব্য-না হরিবে,- পর নারী সহবাসে- থাকবে- রে- বিরতি। মিথ্যা বাক্যকটু কথা, বলবেনা আর বৃথা কথা, নেশা দ্রব্য ত্যাগ করিবে- রক্ষা করবে-এই পঞ্চনীতি। ঐ
মখবাঃ হে মহাভাগ! তোমার উপদেশ বাণী- উজ্জ্বল হয়ে থাকুক- আমার শুভ যাত্রী পথে। চিরদিন মেনে চল্‌ব- তোমার উপদেশ, আমি পঞ্চশীল পালন করে- আমার যাত্রা শুরু করবো।
মখবা ঃ আর মানুষের কাছে শিক্ষাদেব- এই পঞ্চনীতি।
(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ)
ও ভাই- মানব সেবা- বড় ধর্ম্ম-
মানুষেরে- ভালবাসা।
রাস্তা ঘাট তৈরী কর পথিকের পথ যাওয়া-আসা,
পুল সেতু কর নির্ম্মান,
উঁচু-নীচু কর সমান,
পথিকেরে কর জলদান।
মিটাইবে- জল পিপাসা। ঐ
মখবা ঃ হে মহা মানব! আমি সারা জীবন- মানুষের সেবা করে যাব। তোমার উপদেশ হবে আমার যাত্রাপথের সহায়সম্বল। পথিকের চলবে পথ- রাস্তাঘাট তৈরী করবো।
মখবা ঃ অসমান পথকে সমান করে দেব- আর পুল সেতু নির্মাণ করবো আর ছায়াযুক্তস্থানে জলছত্র নির্মাণ করে জলভান্ড রেখে দেব- পথিকগণের পিপাসা দূর হবে। এবং পথিকগণের বিশ্রামের জন্য পথের চৌমাথায় পান্থশালা তৈরী করে দেবো- তা হবে- মানুষের সেবা ধর্ম্ম পালন করা। কিন্তু এইসব কাজ করতে হলে সহকর্ম্মীর প্রয়োজন হবে।
(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ)
ও ভাই-অভাব কিছু- নাই এ গজতে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়- অভাব কোন হয়না তাতে। ঐ
কুশল কর্ম্ম করবে- যখন, সঙ্গীর অভাব- না হবে কখন, কতলোক এসে- আপন মিল্‌বে কর্ম্মী তোমার সাথে। (ধর্ম্মানন্দ প্রস্থান)
মখবা ঃ হে মহামানব! তোমার বাণী- মাথা পেতে নিয়ে মানুষের সেবা ব্রতে ব্রতী হব আমি। আর সপ্তবিধ ব্রত করিব পালন। জনক জননী সদা সেবি কায় মনে, ভক্তি শ্রদ্ধা করবো যত- কুল জ্যেষ্ঠ জনে। সত্যভাষী- মিষ্টভাষী-জিতক্রোধ আর পরপরী বাদ্রে রত রসনা না-যার, এহেন নির্ম্মল চেতা-মাধু সদাশয়, ত্রিদশ নন্দন,ইহা জানিবে নিশ্চয়।

(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ প্রবেশ)
ও ভাই- সপ্তবিধ ব্রত তুমি- করিবে পালন।
জনক-জননী সদা সেবা কর ভক্তি শ্রদ্ধামন। সত্যভাষী-মিষ্টভাষী,
জিত ক্রোধ- মনে নাশি, ভক্তি শ্রদ্ধা কর যত-কুল জ্যেষ্ঠজন। ঐ
(ধর্ম্মানন্দ প্রস্থান)
মখবা ঃ এবার আমি, জীবনের যাত্রা পথে ধী-রে ধীরে হব অগ্রসর। সহকর্ম্মী- করিব সন্ধ্যান। মহাপুরুষের বাণী- করিয়ে স্মরণ- সদকর্ম্ম করিয়ে সাধন, সার্থক করিব- এই ক্ষনভঙ্গুর মানব জীবন। হে-ধর্ম্ম- আমার- এই যাত্রা পথে সহায় হও, গিয়ে দেখিসহকর্ম্মী মিলিবে কোথায়? (ধীরে- ধীরে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক
(তৃতীয় দৃশ্য)
স্থান- রাজসভা
(রাজা ব্রহ্মদত্ত-রানী শীলবতী ও মন্ত্রী বলবাহন প্রবেশ)
ব্রহ্মদত্ত ঃ দেখ রানী! আজি ধরণীর কি সুন্দর শোভা মনোরম, গাছে শাখে সুমধুরস্বরে- বিহগ-বিহগিনী করে গান। এই রাজগ্রহ নগরে আজ-বিরাজিত শান্তি নিকেতন।
শীলবতী ঃ মহারাজ! তা-হলো- একমাত্র আপনার সুশাসনে-রাজ্যময় শান্তি বিরাজ করছে। রাজ্যের পশু পক্ষীরা ও আজ আনন্দে মাতোয়ারা।
ব্রহ্মদত্ত ঃ সুজলা-সুফলা, শস্য ও শ্যামলায় পরিপূর্ণ প্রকৃতির লীলাভূমিও এই রাজ গৃহ নগর। পুত্র সম প্রজাগন- অতি সুশাসনে আমি করেছিং পালন, বসি- এই রাজ সিংহাসনে। বল মন্ত্রিবর! রাজ্যের প্রজা পুঞ্জসবে কোন দুঃখ দৈন্যের অভাব অভিযোগ রয়েছে কিনা?
বলবাহন ঃ মহারাজ! রাজ্যময় সর্ব্বত্র শান্তি শৃঙ্খলায় বিরাজ মান। মহারাজের সুশাসনে রাজ্যবাসীগণের কোন দুঃখ দৈন্যের-অভাব অভিযোগের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছেনা।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রি! এমনভাবে আমি রাজ্য শাসন- করতে চাই। প্রজাগণ আমার রাজ্যে সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক। রাজ্যের আনাচে-কানাচে যেন- দুর্ভিক্ষ ও মহামারি চিহ্ন দেখা যায় না। আর চোর, ডাকাতের ভয় ও দস্যু তস্করের উপদ্রব চিরতরে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়।
বলবাহন ঃ মহারাজ ! রাজ্যে কোথাও চোর ডাকাতের ভয় আর দস্যু তস্করের উপদ্রব হয়েছে বলে ঐরূপ কোন সংবাদ তো-এখনও পাওয়া যায়নি।
ব্রহ্মদত্ত ঃ তা-সত্য মন্ত্রিবর! রাজ্যে যদি কোন চোর, ডাকাতের উপদ্রব আর দস্যু তস্করের ভয় না থাকলে- তাহলে রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ সবে রাত দুপুরে দরজা খোলা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবেন।
বলবাহন ঃ মহারাজ! সত্য বটে- রাজ্যে যদি চোর, ডাকাতের উপদ্রব না থাকলে প্রজাগণ খুব সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।
ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রি! আমার রাজ্যের প্রজাগণ যাহাতে বিনা উপদ্রবে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন- তার প্রতি লক্ষ রাখা হলো রাজার কর্ত্তব্য।

বলবাহন ঃ মহারাজ! প্রজাগণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে রাজ্যের প্রজাগণকে পালন করা রাজার কর্তব্য বৈ কী? তাই- রাজ্যের সমস্ত খবর-দৈনন্দিন জেনে রাখা উচিত।

ব্রহ্মদত্তঃ মন্ত্রিবর! রাজ্যময় এবার ঘোষনা করে দিতে হবে- রাজ্যে কোথাও যদি চোর, ডাকাত ও দস্যু তস্করের উপদ্রব হচ্ছে- বলে সংবাদ পাওয়া গেলে তা-হলে সেই দস্যু ও তস্করদেরকে ধরে এনে বিনা বিচারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

বলবাহন ঃ মহারাজ! আমি শীঘ্রই আপনার আদেশ ঘোষনা করে দেবো- রাজ্যের আনাচে-কানাচে।

ব্রহ্মদত্তঃ শোন মন্ত্রি মহাশয়! আমি দুষ্টের দমন করবো, আর শিষ্টের পালন করবো।

বলবাহনঃ দৈবারিক!

(দৈবারিক প্রবেশ)

(তরবারি কুর্নিশ করিয়া, রাজাকে প্রনাম জানাইল)

ব্রহ্মদত্তঃ শোন দৈবারিক! সারারাজ্যে ভেরীবাদকের দ্বারা ঘোষনা করে দাও। আমার রাজ্যে চোর-ডাকাত, দস্যু তস্করদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

দৈবারিক ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ! (তরবারি কুর্নিশ করিয়া দৈবারিক প্রস্থান)

ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রিবর।

সকল রাজা কর্মচারীগণকে জানিয়ে দাও- রাজ্যে কোথাও চোর ডাকাতের খরব পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

গোপনে সংগ্রহ কর।

বলবাহন ঃ মহারাজের আদেশ পালন করতে আমি অবহেলা করব না।

ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রি। আমি চাই আমার রাজ্যে চোর ডাকাত দস্যু-তস্কর বিলুপ্ত হয়ে যাক। প্রজাগণ রাজভক্ত হোক আর আমার আদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করুক।

বলবাহন ঃ মহারাজ প্রজাগণ রাজভক্ত সকলে আপনার আদেশ পালন করবে।

ব্রহ্মদত্ত ঃ শোন মন্ত্রিবর! যেই রাজ্যে দস্যু-তস্করের উপদ্রব নেই, চোর-ডাকাতের ভয় নেই, আর দুর্ভিক্ষের হাহাকার- মহামারি করাল ছায়া-বিদ্বেষের হলাহল- বিবাদের কোলাহল নেই সেই রাজ্যের প্রজাগণ- স্বর্গসুখের সুখী।

বলবাহনঃ সত্য মহারাজ! আপনার সুশাসনে প্রজাগন নিশ্চয় সুখী হবে। তখন স্বর্গের অমরাপুরী- নেমে আস্‌বে ভূতলে। রাজা যদি ধার্ম্মিক ও শীলবান হয় সেই ধার্ম্মিক রাজার দেশ স্বর্গের সমান।

ব্রহ্মদত্ত ঃ চল আজ বিশ্রাম করিগো। (সকলে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

(চতুর্থ দৃশ্য)

স্থান- নগর পথ (ভেরী বাজাইতে ২ ভেরীবাদকের প্রবেশ)

ভেরীবাদক ঃ শোন-শোন!! শোন!!! নাক-আর কান খাড়া করে শুনে- যা। মহারাজের আদেশ- রাজ্যে চোর-ডাকাত্- আর দস্যু তস্করের খুব বড় সাজা হবে। একে বারে বিনা বিচারে প্রাণটা যাবে। (ভেরীবাদক)

(দুইজন নাগরিক প্রবেশ)
১ম নাগরিক ঃ আ-রে ভায়া- তুমি কিসের ঢোল পিটাও।
২য় নাগরিক ঃ ভাল কর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলনা- কিসের ঢোল্।
ভেরীবাদক ঃ (ভেরী বাজাইতে বাজাইতে) শোন্! রাজার হুকুম। রাজ্যের চোর-ডাকাতদের কঠোর শাস্তি। বিনা বিচারে-বিনা বিচারে মানে- একেবারে- প্রাণটা নিয়ে টানা-টানি-। (ভেরী বাদক ভেরী বাজাইতে ২ প্রস্থান)
১ম নাগরিক ঃ আ-রে সে কেমন কথা, একেবারে বিনা বিচারে- নাকি প্রাণদন্ড। বাপ্‌রে-বাপ্।
২য় নাগরিক ঃ বলিস কি! রাজার হুকুম কড়া না হলে রাজ্য চল্‌বে কি করে।
১ম নাগরিক ঃ আগে বিচার করে দেখ্- তারপর বিচারে যা- হয়।
২য় নাগরিকঃ বলিস্ কি! চুরি না করলে- কেউ তাকে চোর বলে না। চুরি করা মহা পাপ। তাই পাপীকে পাপের সাজা পেতে হবে।
১ম নাগরিকঃ কিন্তু বিনা অপরাধে যদি প্রাণদন্ড হয় তা-হলে তো। দরুন- যদি তোমার নামে আমি মিথ্যা নালিশ করে দিই - তুমি চুর বলে। তা-হলে- রাজার হুকুম মতে বিনা বিচারে- একেবারে তোমার প্রাণ- যাবে।
২য় নাগরিকঃ বলিস কি! যদি আমি ভাল মানুষ হই- তা-হলে তুমি আমার নামে মিথ্যে নালিশ করতে যাবে কেন?
১ম নাগরিক ঃ ধর্‌না- যদি তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া বিবাদ হলো, কিংবা তুমি আমার স্বার্থেরহানি করে বস্‌লে,- তখন আমি রাগের মাথায় গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করে দিলেম- তুমি একজন চোর, -তা-হলে তুমি- বিনা বিচারে- খতম।
২য় নাগরিকঃ বলিস্ কি! বিনা বিচারে প্রান দন্ড দেওয়া- এইটা রাজার ধর্ম্ম নহে। রাজ্যে প্রজা পালন- করবে রাজা।
২য় নাগরিকঃ রাজা ধর্ম্ম মতে সুবিচার করে দেখবে- অপরাধী কিংবা নিরপরাধী ভাল-মন্দ বিচার করে দেখে শুনে তারপর দন্ড বিধি আইন।
১ম নাগরিক ঃ এদেশের রাজা খুব ভালমানুষ কিন্তু রাজার মেজাজটা যে বড় কড়া, আবার কড়া মিঠে কিনা!
২য় নাগরিক ঃ বলিস কি! কড়া আবার মিঠে এ কেমন কথা, তা- বুঝে-শুনে বলনা।
১ম নাগরিকঃ এদেশের রাজা- তার রাজ্যে চোর ডাকাতের নামটা শুনতে চাননা চোর ডাকাতের নাম শুনলেই একেবারে তেলে বেগুনে আগুন। রাজা শুনতে চায়- তার রাজ্যের প্রজাগণ ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক।
২য় নাগরিকঃ বলিস্ কি! তা-হলে বুঝি রাজা পুত্রের মত প্রজাগণকে দয়া করেন।
১ম নাগরিকঃ রাজার সুশাসন হলো- পুত্রের মত দয়া করে প্রজা পালন করা- আর সুবিচার করা।
২য় নাগরিকঃ বলিস্ কি! তবে বুঝি রাজার শাসন হলো মিঠে আর হুকুম হলো- খুব কড়া।
১ম নাগরিকঃ এদেশের রাজার শাসন এমন মিঠে রাজ্যে কোথাও চোর-ডাকাতের নামগন্ধ ও নেই।

২য় নাগরিকঃ বলিস্ কি! রাজার খুব কড়া হুকুম কি-না! চল্ বেলা অনেক হলো। খবরটা পাড়ায় বলিগে
(উভয়ে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক
(পঞ্চম দৃশ্য)
স্থান ঃ- মচল গ্রাম মন্ডলের গৃহ (জমিদার বেশে মন্ডল ও মনিরাম প্রবেশ)
মন্ডল ঃ মনিরাম!
মনিরামঃ আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু।
মন্ডল ঃ মনিরাম! এখন হাল চাল কি রকম। দেশের খবর-তবর-!
মনিরাম ঃ আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু! গতকাল হাটে গেছিলাম- হাড়ী বেটা ঢোল পিটায় রাজার কড়া হুকুম চোর-ডাকাত্ বিনাবিচারে প্রাণদন্ড।
মন্ডল ঃ মনিরাম! রাজার হুকুম খুব কড়া- তা-জানিস্! খুব সাবধান। চোর-ডাকাতের কোন খবর-টবর পাওয়া যায় কিনা দেখ্।
মনিরামঃ আজ্ঞে কর্ত্তা বাবু! চোর-ডাকাতের খবর নিতে সবসময় আমার কানখাড়া। অন্ততঃ খবরটা দিতে পারলে আমার অনেক বক্‌সিস্ কিনা।
মন্ডল ঃ মনিরাম! গ্রামের লোকেরা মদ্ খেয়ে মারা-মারি কাটা-কাটি করে আসে আমার কাছে নালিশ কর্‌তে।
মনিরাম ঃ আজ্ঞে কর্ত্তা বাবু! তখন বেটাদেরকে আচ্ছা জরিমানা করে সাজা দেন। আচ্ছা চলুন কর্ত্তাবাবু! (উভয়ে প্রস্থান)
স্থান ঃ গ্রাম্য পথ (ভজানন্দ-গজানন্দ-মদের বোতল হাতে মদের গান করিতে ২ প্রবেশ)
(উভয়ে মদ্য) পান করিতে ২ গান)
মোরা-মদ খেয়েছি- মাতাল হয়েছি, হয়েছি-বিভোর।
মদের বোতল সঙ্গে করে-
পড়ে থাকি রাস্তার ধারে-
স্বর্গ-মর্গ্য-পাতাল দেখি
মাথায় নেশা ঘোর। ঐ
ভজানন্দ ঃ আরে দাদা গজানন্দ- ও গজা, মদের কত মজা।
গজানন্দঃ তোর নাম হলো ভাজা,
আমি শালা গজা,
মদ যে বড় মজা।
ভজানন্দঃ তুই আমাকে শালা বল্‌লি! ও রে- শালার- গজা।
গজানন্দ ঃ তুই কি বল্‌লি শালার ভাজা, আমি মদের নেশায় দিশে হারা। (মদের বোতল হইতে মদ্য পান করিতে লাগিল)

(মদের বোতল দিয়ে ভজাকে মারিবার উদ্যত- হইলে এখন সময় মদের বোতল হাতে মদওয়ালী প্রবেশ।

মদওয়ালী ঃ আরে রাখ্ রাখ্ আমার কথা ধর।
শোন মদের নূতন খবর।
আমার মদের এমনি গুণ,
বিক্রী করে পয়সা দ্বিগুণ,
দেখ্না খেয়ে ভজা-গজা,
আমার মদের কত মজা।

ভজানন্দ ঃ আয় রে বোন্ মদ্ওয়ালী, নূতন মদের খবর কি শুনালী। শুন্ শুন্ পরানের বোন্, তোর মদের দেখি কেমন গুন।

মদওয়ালী ঃ পয়সা দাও আগে দ্বিগুণ,
দেখ্না খেয়ে মদের কিবা গুণ।

গজানন্দ ঃ কাছে এস সুন্দরী বোন্,
তোর মদের বহুত গুণ,
পয়সা দিব দ্বিগুণ-তিনগুণ।

মদওয়ালীঃ নগদ পয়সা দিবে যখন;
মদের বোতল দিচ্ছি এখন,
(গজানন্দ পকেট হইতে মদওয়ালীকে কিছু পয়সা দিয়া মদের বোতল লইল)

গজানন্দঃ আচ্ছা লও সুন্দরী মদের দাম। (মদের পয়সা লইয়া বোতল দিয়া মদওয়ালী প্রস্থান)

ভজানন্দ ঃ আ-য় বোন মদওয়ালী,
তুই আমার পরান বাঁচালী। (চারিদিকে মদওয়ালীকে খুঁজিতে লাগিল)

গজানন্দ ঃ হায়! হায় !! কোথায় তুমি লুকিয়ে গেলিরে। মদওয়ালী যেমন সুন্দরী,
তার মদের ইন্দ্রপুরী।

ভজানন্দ ঃ ও-রে শালারপুত শালা,
দিব তুর কান মলা। (ভজা- গজার কান মলিয়া দিল)

গজানন্দ ঃ আরে শালার বেটা শালা,
তুই দিলি আমার কান মলা।

ভজানন্দ ঃ তুই শালার পুত শালা বড় গাধা।

গজানন্দঃ আর তুই শালা তেলির বলদ্ ।
তুর চোখে মালা- বাধা।

ভজানন্দ ঃ তুই শালা বড় খচ্চর।

গজানন্দঃ তোর শালার পিঠে দেব পচ্চর পচ্চর। (গজা-ভজার পিঠের উপর কিল মারিল)

ভজানন্দঃ শালী হাগাইয়া দিলরে,
ও-রে শালার গজা-তুই আমার পিঠে কিল দিলি- তোকে একবার মজা দেখাচ্ছি। (গজাকে লাঠি মারিল)
গজানন্দ ঃ তুই শালা আমাকে লাঠি মারলি,
ভজানন্দঃ তুই আমার পিঠে কেন কিল দিলি।
গজানন্দ ঃ তুই শালা বেয়াদপ।
ভজানন্দ ঃ তুই শালা উল্লুক।
গজানন্দ ঃ তুই আমাকে উল্লুক বল্‌লি।
ভজানন্দ ঃ তুই আমাকে কেন বেয়াদপ বল্লি, বেল্লিক কোথাকার।
গজানন্দ ঃ তুই শালার বিরুদ্ধে মন্ডলের কাছে আমি নালিশকরতে যাব। (গজানন্দ রেগে প্রস্থান)
ভজানন্দ ঃ শালার পুত শালার বেটা, গজা বেটা তুই আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাচ্ছ। (ভজানন্দ হেলে দোলে প্রস্থান)........ চলমান

লেখক : কবি ও ডাক্তার (প্রয়াত), রাজস্থলী, রাঙামাটি।

মানিক পুদি কন্যা

লগ্ন কুমার তন্চংগ্যা

কথক : মোহন লাল তঞ্চঙ্গ্যা

অনেক অনেক আগের দিনের কথা। একরাজ্যে এক রাজপুত্র ছিল। তার নাম ভাগ্যধন। লেখাপড়া শিখতে শিখতে বড় হল। যৌবনে পদার্পন করল। এক সময় তার ইচ্ছা হল। পিতৃরাজ্যের সীমানা ঘুরে দেখতে। সে তার পিতার সভা পন্ডিতের ছেলে সত্যরামকে সঙ্গী হিসেবে তার মনের ইচ্ছার কথা খুলে বলল। সত্যরামও উৎসাহ ভরে রাজী হল। দু'জনে ঠিক করল, প্রত্যেকে নিজের নিজের পিতার অনুমতি নেবে। অনুমতিও পেয়ে গেল।

যেতে যেতে তারা প্রায় রাজ্য সীমানায় পৌঁছল। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। গভীর জঙ্গল, তারা-ঘোড়াটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখল। নিজেরা পাশের একটা বড় গাছের উপর উঠল। গাছের ঢালে নিজেদের চাদর দিয়ে দোলনা বানাল। রাতের খাবার খেয়ে নিল। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করল যে, পালাক্রমে ঘুমাবে। পন্ডিতের পুত্র সত্যরাম বলল, "বন্ধু, তুমি আগে ঘুমাও, আমি পাহাড়া দিব।" রাজপুত্র ভাগ্যধন বন্ধুর কথা মেনে নিল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সত্যরাম রাত জেগে পাহাড়া দিচ্ছে। গভীর রাতে সে দেখল, চারদিক আলোকিত করে কী যেন একটা তাদের দিকে আসছে। সে রাজপুত্রের ঘুম না ভাঙিয়ে বন্দুক হাতে করে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত একদম নিকটে আসলে সে দেখল যে, আগন্তুক প্রাণীটা একটা মস্তবড় সাপ।

তার মুখে রয়েছে অতীব উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণকারী একটা মানিক। সেই মানিকের আলোতে আশপাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পরে সাপটা তার মুখের মানিক মাটিতে রেখে তাদের ঘোড়াটাকে আক্রমণ শুরু করল। আর কী? সাথে সাথে ঘোড়াটাকে গিলতে শুরু করল, সাপটা যখন মাথার দিক থেকে ঘোড়াটাকে গিলতে থাকে তখন ঘোড়াটা মলত্যাগ করতে লাগল। রাজপুত্র ভাগ্যধন ভয় পাবে মনে করে সত্যরাম তাকে জাগাল না। আর সাপটাকে মারল না। যখন সে দেখল সাপটা ঘোড়াটাকে প্রায় অর্ধেক গিলে ফেলেছে তখন চুপি চারে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে মানিকটা ঘোড়ার মল দিলে ভাল ভাবে ঢেকে দিল। তারপর সংগে সংগে আবার গাছের উপর উঠে গেল। আর মানিকটা হারানোর ফলে সাপটা পাগলের মত হয়ে গেল। দ্রুত বেগে এদিক সেদিক ঘুরা ফেরা করতে লাগল। তার লেজের আঘাতে পংপাং ভংবাং করে গাছ বাঁশ ভাঙতে ভাঙতে গুড়া হয়ে যাচ্ছিল। পেটের ভিতর আস্ত একটা ঘোড়া থাকায় বেশিক্ষণ নড়াচড়া করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে নিথর হয়ে পড়ল। মরে গেল।

এরপর সত্যরামের ঘুম পেয়ে গেল। সে রাজপুত্র ভাগ্যধনকে ডেকে নিজে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাগ্যধন পাহাড়া দিতে দিতে ভোর হয়ে গেল। ভোর হবার পর তাদের পাশেই

ঘটে যাওয়া অদ্ভুত কান্ড দেখে খুব বেশি অবাক ও আতঙ্কিত হল। সে তাড়াতাড়ি সত্যরামকে ডেকে জিজ্ঞেস করল "এ কী ব্যাপার? কী ঘটেছিল এখানে? ঘোড়াটা কোথায়?" সত্যরাম হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে ধীরে ধীরে ভাগ্যধনকে প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে। সে বলল, "যা হয়েছে এখন ভয়ের কিছু নাই। রাত্রে তুমি ভয় পাবে বলে তোমাকে জাগাইনি। এরপর সে ভাগ্যধনকে গাছ থেকে ডেকে নীচে নিয়ে গেল। ঘোড়ার মলের স্তুপের কাছে গিয়ে মল সড়িয়ে মানিকটা তুলে নিল। তারপর একটু দূরে বিরাট মরা সাটা দেখিয়ে বলল। "ঐ সাপটাই এ মানিকটা এখানে রেখে তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের ঘোড়াটাকে গিলতে থাকে। আর ঘোড়ার মাথার দিক থেকে গিলা শুরু করলে ঘোড়াটা মলত্যাগ করতে থাকে। প্রায় অর্ধেক গিলার পর আমি ঘোড়ার মল দিয়ে মানিকটা ঢেকে রাখি। এই নাও মানিকটা। তুমি তো রাজপুত্র। একদিন রাজাহবে। এ মানিকটা অনেক অনেক মূল্যবান। এধরনের মানিক রাজাদেরই দরকার। ল-ও।" রাজপুত্র ভাগ্যধন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মানিকটা গ্রহণ করল।

তারপর তারা আবারও গাছের উপর উঠল, সকালের খাবার খেয়ে নিল। এবারে খানিকটা বিশ্রাম করে। পরবর্তী যাত্রা আবারও দক্ষিণ দিকে রওনা দিল। পায়ে হেটে যেতে যেতে বেশ কিছুদূর যাবার পর এক গহীন অরন্যে তারা একটি বিশাল পুকুর দেখতে পেল। ভাগ্যধন সত্যরামকে ডেকে বলল, "তুমি এখানে একটু বস, আমি মানিকটা ধুয়ে আনি।"

রাজপুত্র ভাগ্যধন মানিকটা ধুয়ার জন্য পুকুরে নামল। সে তখন দেখল যে, পুকুরের নিচের দিকে সুন্দর একটা পাকা রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে দেখার ইচ্ছা হলো। মানিকটা ধুয়ে ভাল করে কাপড় দিয়ে বেঁধে সে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। কিছুদূর যাবার পর সে দেখল যে, গাছে বাঁশে ফুলে-ফলে ভরা সুন্দর একটা শহর। কিন্তু কোন মানুষজন নাই। আর কিছুদূর যাবার পর সে দেখল যে, বিরাট উঁচু একটা পাকা অট্টালিকা কিন্তু দরজাটা তালাবদ্ধ। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কোন মানুষজন দেখা পেলনা। শেষ পর্যন্ত কী যেন ভেবে মানিকটা হাতে নিয়ে বলল, "সত্যিই যদি এ মানিকের সত্য গুন থাকে মানিকটা লাগানোর সাথে সাথেই দরজার তালা খুলে যাবে।" সত্যি সত্যিই তালাটা খুলে গেল। তারপর সে মানিকটা আবারও কাপড় মুড়িয়ে বেঁধে নিল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। জনমানবহীন সুন্দর এক অট্টালিকা। নিচ থেকে উপরে, উপর থেকে আরও উপরে আনাচে-কানাচে প্রায় সবকক্ষ সে ঘুরে দেখল। কোথাও মানুষের কোন চিহ্নও দেখতে পেলনা। অবশেষে সবার উপরে মনোরম একটি কক্ষে দেখল অপূর্ব এক রূপসী কন্যা ঘুমিয়ে রয়েছে। রাজপুত্র ভাগ্যধন ভাবল, হতে পারে কোন মহীয়সী রাজকন্যা। কিন্তু কেন একাকী এভাবে? তাকে জাগানোর জন্য বুদ্ধি করে আশ-পাশে এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করল। না কন্যা জাগেনা। কুমার ভাগ্যধন গভীর চিন্তায় পড়ল। পরে হঠাৎ তার মনে পরল, বাল্যকালে দাদা-দাদীর কাছ থেকে শোনা-নানা-কিস্সা কাহিনীর কথা। তার মনে পড়ল, শিয়রের কাঠি পায়েতে, পায়ের কাঠি শিয়রে নিলে পর জেগে ওঠে কন্যা বলবে

কথা ভরভর।" ভাগ্যধন কন্যার আশেপাশে ভাল করে দেখল, তার চোখে পড়ল, কন্যার শিয়রে আর পায়ের নীচে একটি করে চকচকে দু'টি ছুড়ি। তারপর আশপাশে ভাল করে দেখে নিয়ে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করল। ছুড়ি দু'টি নিয়ে কন্যার শিয়রেরটা পায়ের নিচে এবং পায়ের নীচেরটা শিয়রে রেখে দিল। আর সংগে সংগে রাজকন্যা জেগে উঠল। জেগেই দেখল, সুন্দর সুঠামদেহী সুপুরুষ রাজপুত্র ভাগ্যধনকে।

রাজকন্যা দীর্ঘকাল পর মানুষ কাছে পেয়ে যেমন যারপর নাই খুশী হল তেমনি হঠাৎ কোত্থেকে, কেমনে এসব প্রশ্নে ভয়ে আনন্দে বিহাল হয়ে উঠল। একটু পরে সম্বিত ফিরে রাজ কুমারকে প্রশ্ন করল, "কে তুমি" কোত্থেকে কী উদ্দেশ্যে বা কেমনে এখানে প্রবেশ করলে?"

ভাগ্যধন কন্যার প্রশ্নের জবাব দিল। কন্যার কক্ষে পৌঁছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবরণসহ নিজের পরিচয় দিল। সবকথা শোনে বুঝে ভাগ্যধনের প্রতি রাজকন্যার দয়া হল, চিন্তা করল, "রাক্ষুসী যদি এখন আসে রাজকুমারকে তো সাড়বেনা। খেয়েই ফেলবে।" কুমারকে সে বিস্তারিতবুঝিয়ে এখনই অন্যত্র চলে যেতে বলল। কারণ রাক্ষুসী আমাদের শহরের সব মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। কেবল আমাকে সুন্দর দেখে ভাল লেগে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাঝে মধ্যে আমাকে দেখার জন্য এখানে আসে। সে আসলেই আমাকে জাগিয়ে তোলে আর যাবার আগে ঘুম পারিয়ে রেখে যায়। কিন্তু রাজপুত্র ভাগ্যধন সহজে দমবার পাত্র নয়, সে রাক্ষুসীকে দেখতে চায়।

ভাগ্যধনের সাহস দেখে রাজকন্যা বলল, রাক্ষুসী এসে যাতে তোমাকে না দেখে এজন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।" সে আরও বলল, "ঐ পুকুর পাড়ে পূজার পরে ফেলে দেওয়া ফুলের স্তুপে লুকিয়ে থাকতে পার।"ভাগ্যধন কন্যার কথামত সেভাবেই লুকিয়ে থাকলো।

ভাগ্যধন যেইমাত্র লুকাল, অমনি রাজকন্যার কক্ষে রাক্ষুসী এসে পৌঁছল। রাক্ষুসী আসার পর কক্ষে কী যেন অস্বাভাবিক গন্ধ পেল। রাজকন্যাকে বলল, "আহা কী যেন পাকা চিড়া মাপদার মতো জুমের একধরনের সুমিষ্ট ফল। "চি-ড়ার" গন্ধ পাচ্ছি।" উত্তরে রাজকন্যা রাক্ষুসীকে বুঝিয়ে বলল, "নানী আর কোত্থেকে গন্ধ পাবে? আমি তো এখন ভরপুর যৌবনেপূর্ণ। লোকে বলে যুবতী হলে নাকি যৌবনের গন্ধ ছড়িয়ে পরে। তাই আমার গন্ধই হয়তো তোমার কাছে নতুন লাগছে।" রাক্ষুসী বুঝ পেয়ে চুপ মেরে রইল।

রাজকন্যার প্রবল ইচ্ছা জাগে কেমনে, কখন রাক্ষুসীর হাত থেকে রেহাই পাবে। আর আগত রাজ কুমারের সাথে আবারো মিলিত হতে ও আরও সুখ দুঃখের নানা কথা বলতে। হঠাৎ সে বুদ্ধি আটল। রাক্ষুসীকে বলল, নানী! বহুদিন হয় তোমার মাথায় উকুন দেখিনি, আজ একটু দেখে দিই? রাক্ষুসী রাজী হল।

রাজকন্যা রাক্ষুসীর মাথায় উকুন দেখতে থাকে। কিছুক্ষন পর বুদ্ধিমতে রাক্ষুসীর কোলে নিজের-মুখের লালা ফেলে দেয়। এতে রাক্ষুসী টের পেয়ে জিজ্ঞেস করে, কাঁদছিল যে?

চি-ড়া = মারফার মতো জুমের এক ধরনের সুমিষ্ট (জুমের) ফল।

কন্যা উত্তরে বলে, তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কেউ নাই। তুমি তো আমাকে ঘুম পারিয়ে ফেলে যাও। ভগবান না করুক এ অবস্থায় হঠাৎ যদি তুমি মরে যাও। তাহলে আমাকে জাগাবার আর কেউ থাকবেনা। এমনি অবস্থায় ঘুমের মধ্যে আমি ও মরে যাবো। জীবনে আর কিছুই তো পেলামনা। এসব কথা ভেবে সত্যিই চোখে জল এসে পরল। মাপ করো নানী! ঈশ, তোমার গায়ে চোখের জল পড়েছে?"

রাক্ষুসী বলে, "ও! এই ভেবে কাঁদছ? না, কাঁদিসনে। আমি রাক্ষুসী সহজে মরব নারে। আর আমাকে মারতে পারে এ-মুল্লুকে তো কেউ নেই। শোন, আমাকে মারতে পারবে সুদূর উত্তরের রাজ্যের মানব কুলের এক রাজপুত্র। সে যৌবনে পরিপূর্ণ হয়ে রাজ্য ভ্রমণে বের হবে। দক্ষিণ দিকে আসার সময় মাঝপথে একটা বড় সাপের কাছ থেকে একটা মানিক পাবে। সেই মানিকের গুণে সে এখানে পৌঁছাবে। কিন্তু তারপও সে আমাকে সহজে মারতে পারবেনা।

কন্যা ঃ "একজন বেটাই কী তোমাকে সহজে মেরে ফেরতে পারে?

রাক্ষুসীঃ "হ্যাঁ", তার হাতে থাকা মানিকের গুনেই সে আমাকে মেরে ফেলতে পারে।"

কন্যাঃ "আমি কল্পনাও করতে পারিনা। অসম্ভব।

রাক্ষুসীঃ "সে যখন এ শহরে পৌঁছবে সুন্দর এ নতুন অচেনা রাজ্য দেখে মুগ্ধ হবে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে ফিরে দেখতে থাকবে। কিন্তু কোন মানুষের সাক্ষাৎ না পেয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করবে। অনেকটা আত্মভোরা হয়ে পরবে। ইতিমধ্যে আমি যখন আসব আমার দানবীয় মূর্তি দেখে সে ভীত হয়ে পরান বাঁচাতে গিয়ে তার ঐ মানিকটা সহ বাগানের পুকুরে ডুব দেবে। কিন্তু তার মানিকের গুনে পুকুরের পানি দু'ভাগ হয়ে তারজন্য সুন্দর রাস্তাকরে দেবে। সে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পুকুরের তলা থেকে একটি বাক্স পাবে। আর সে বাক্সের ভিতরে থাকবে একটি কালা ভোমরা। ভোমরাটা পেয়ে সে খেলতে চাইবে। এং ডানা ও হাত পা ভেঙ্গে দিতে চাইবে। কথা হলো- সে ভোমরার একটি হাত ভেঙ্গে দিলে আমারও একটি হাত ভেঙ্গে যাবে। আর ভোমরার একটি পা ভেঙ্গে দিলে আমারও একটি পা ভেঙ্গে যাবে। আর একেবারেই যদি ভোমরাটা মেরে ফেলে তাহলে আমিও মরে যাব। কারণ সেই ভোমরাটার মাঝেই আমার প্রাণ।

কন্যাঃ "তা কী করে সম্ভব নানী? তোমার পরাণ তো তোমার কাছেইনা থাকবে। ভোমরার কাছে কেন?

রাক্ষুসীঃ "হ্যাঁ-হ্যাঁ তা-ই। আমি তোমাকে নিখুঁত সত্য কথাই বলছি বোন। এখানে কোন ফাঁক নাই।

কন্যাঃ "তাই যদি হয়তো আরও ভালো। কারণ তোমাকে যদি কেউ মারতে চাইতো তোমার পরানটা তো আর দেখবে না। তাই তোমাকে কেউ কখনো মারতে পারবেনা।"

রাক্ষুসীঃ "এই জন্যই তো তোমাকে বলছি। চিন্তা করবেনা, কাঁদবেনা, আমি মরব নারে বোন মরবনা। আচ্ছা, আজকের মত চলে যাই।"

কন্যাঃ "আর কতদিন পর আসবে?"

রাক্ষুসীঃ "দেরী করব না।" একথা বলে কন্যাকে ঘুম পারিয়ে চলে গেল।

রাক্ষুসী চলে যাবার সময় আকাশে বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা গেল। ওদিকে পুকুর পাড়ে লুকিয়ে থাকা ভাগ্যধন অবস্থা বুঝার জন্য আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করল। পরে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ফুলের স্তুপ থেকে বেরিয়ে এল। সন্তর্পনে অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে, রাজকন্যার নিকট গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল।

রাজকন্যা এক রাক্ষুসীর হাতে নিজের মা-বাবা-জ্ঞ্যাতি-গোষ্ঠী সবাইকে হারিয়ে চরম অসহায় অবস্থায় বেঁচে রয়েছে। তাও রাক্ষুসীর ইচ্ছায় প্রায় অর্ধমত অবস্থায়। ঠিক তেমনি সময়ে সুন্দর, সবল, সুঠাম ও বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবরাজকে কাছে পাওয়া সেতো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ যেন তাঁকে বাঁচানোর জন্য স্বয়ং ভগবানেরেই আর্শিবাদ! তাই যুবরাজকে আবারো কাছে পেয়ে যুবরাজের চরণে লুটিয়ে পরে বলল, ওগো মোর ত্রানকর্তা! তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার জীবন, মন-প্রাণ সবই তোমাকে দিলাম। চিরদিন আমি তোমার সেবাদাশী হয়ে থাকব। রাক্ষুসীর হাত থেকে আমাকে মুক্ত করো।

কন্যার কথা শোনে আর অবস্থা বিবেচনায় কন্যার প্রতি কুমারের মন দরদে ভরে গেল। বুক ফুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কন্যাকে বলল, "বুঝলাম তোমার কথা, মেনে নিলাম তোমাকে আমার জীবন সাথী রূপে, কিন্তু সত্য করেই বল, রাক্ষুসী এসে কী করল আর কী বলে গেল?"

কন্যা ঃ রাক্ষুসী এসে সে প্রথমেই মানুষের গন্ধ পেয়েছে তা কীভাবে কাটিয়ে দিয়েছে এবং কৌশলে সে রাক্ষুসীর কাছ থেকে তার পরান কোথায় রয়েছে, কে কীভাবে তাকে মেরে ফেলতে পারবে সেসব তথ্য আদায় করে নিয়েছি- সবকিছু কুমারকে বুঝিয়ে বলল। আর বলল সে, রাক্ষুসী তাড়াতাড়ি আসবে বললে- দেরীতে এবং দেরীতে আসবে বলে গেলে তাড়াতড়ি আসে।এবার বলে গেলো তাড়াতাড়ি আসবে। সুতরাং এখনই রাক্ষুসীকে মারার উপযুক্ত সময়।

রাজকন্যা থেকে বিস্তারিত সবকিছু জানার পর একান্ত আত্ম-বিশ্বাসের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মানিকটা হাতে নিয়ে ভাগ্যধন কন্যাকে বলে, "চল। ডানহাতে মানিক আর বাম হাতে কন্যাকে ধরে কুমার ভাগ্যধন পুকুরের পানিতে নামল। আর তাদের পুকুরের পানিতে নামার সাথে সাথেই আশ্চর্য্য জনকভাবে পুকুরের পানি দু'ভাগ হয়ে গেল। মাঝখানে পুকুরের তলা পর্যন্ত সুন্দর একটা রাস্তা সৃষ্টি হল। সে রাস্তা দিয়ে দু'জনে এক সঙ্গে এগিয়ে গেল। তারা দেখতে পেল পুকুরের তলায় পরে রয়েছে একটা বাক্স। আশ পাশে খেয়াল করে দেখল সেখানে আর অন্য কিছু নেই" তাই বাক্সটা নিয়ে উভয়ে তাড়াতাড়ি রাজ প্রসাদে উঠে এসে রাজকন্যার কক্ষে ঢুকে পড়ল। খুব দ্রুত কক্ষের দরজা-জানালাসহ সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দিল। বাক্সটা নিয়ে কন্যার পালঙ্কে বসে ভাল করে মশারী ফাটিয়ে নিল। এবার ভোমরা যায় কোথায়? দু'জনে ধীরে ধীরে খুব সর্তকভাবে বাক্সটা খুলতে শুরু করল। বাক্সের ভিতরে থেকে তারা একটা "লু-ঢুং পেল। সেই ছোট 'লু-ঢুং'

এর ভিতরে ভোমরাটা প্যান-প্যান শব্দ করছে। তারা পাতলা অথচ শক্ত একটা সাদা কাপড়ের টুকরা লু-ঢুং-এর মুখে ধরে ছিপিটা টেনে খুলা মাত্রই ভোমরাটা কাপড়ের পুতুলীতে ধরা পড়ল। তারপরে কাপড়ের পুতুলীটা ভাল করে ধরে উভয়ে প্রায় সমস্বরে উচ্চাবরণ করে "কোথায় যাবে রাক্ষুসী? এবার তোর পরান শেষ!"

ওদিকে যতদূরেই থাকনা রাক্ষুসীর গায়ে প্রচন্ড কম্প দিয়ে জ্বর শুরু হয়। তার আর বুঝতে বাকী নেই যে, তার পরান ভোমরা ধরা পড়েছে। তাই সে পাগলের মত করে ঝঞ্জাবেগে শোঁ শো করে আকাশ বাতাস কম্পিত করে প্রান রক্ষায় উড়ে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে কুমার ভাগ্যধন ভোমরাটার হাত্-পা আর পাখাগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। আর সাথেসাথে রাক্ষুসীর হাত, পা আর পাখাগুলো তার শরীর থেকে খসে পড়ল। তবু সে বড় এক পাথরের মত গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল। ঝঞ্জা বাতাসের শব্দ করে প্রায় নিকটেই পৌছে গেছে। ঠিক সে মুহূর্তে শ্বশানপুরী শহরের সুউচ্চ প্রাসাদের নিশ্চিদ্র কক্ষে অবস্থানকারু দু'টি মানব মানবী রাজকন্যা আর কুমার ভাগ্যধন দৈববানী শোনতে পেল, আসছে, রাক্ষুসী আসছে। ও কুমার, ভোমরার মাথা ছিড়ে ফেল! রাক্ষুসীকে মেরে ফেল!" হঠাৎ সেকথা শোনে সেই মাত্র ভাগ্যধন ভোমরার মাথা ছিড়ে ফেলল! বিরাট রাক্ষুসী আকাশ-বাতাস কম্পিত করে, বজ্রপাতের মত আওয়াজ সহকারে পুকুরপাড়ে পরে মরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নীবর নিস্তব্দ হয়ে গেল।

তারপর যুবরাজ ভাগ্যধন আর রাজকন্যা পরস্পরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞাতার দৃষ্টিতে একে পরের দিকে দীর্ঘক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো। অবশেষে প্রশান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে একে অপরকে বুকে টেনে নিল।

লু-ঢুং = লাউয়ের খোল।

লেখক : লগ্ন কুমার তনচংগ্যা, শিক্ষক, রাজস্থলী।

উলু-মিত্তত্ব

বি.এন. তঞ্চঙ্গ্যা

লাম্বা-বাইন। ফাউনর হা-বা- ফিরের নানান ফুল-বাইত, ঝাড় পাই-চ-র-শুনিনে ফুলবিত্তুন-তা-অতীত-জীবনর কদাওন মনত্ উদের। মাদা-খবঙর-ফুল তুলিদে-তুলিদে-মনান ঘটি:যাইয়া পুরানা দিনর-দৃশ্যউনি মনত্ উ-দের। দিউলছড়ি আদাম্। মুড়ালেছাত ঘন ঘর। দিউলছড়ি আদামত কালামঙ্যাদাই ঘর। কালমঙ্যাদাই খুব-গুরীব। তা-পইল্যা বউবা-মুরি গিয়ে। পইল্যা বউবার-কোন-পয়া-ছয়া নাই। কালামঙ্যা বউ-মুরিনে-মাইনষ্য-ঘরত-বছর-টিয়া কাম-গড়ে। বেড়াবার সময়-ন-পায়। তা-গি-র-ইত্-ত-বা-একদিন কালামঙ্যারে ছুটি-দিল। কালামঙ্যা বি-ল্লা-বিলল্যা গুরি তা-জিদু-ঝিন- রেজনবিদাই ঘরত বেড়া গিয়ে। রেজনবি জামাই-কান্দারা-কালামঙ্যা-বনই। কান্দারালই-কালামঙ্যা দ্বি-শালা-বুন্না-বইনে গপ দি-আ-হন্। রেজনবি-ভাত, চন্ রানের। রাইদত্-ভাত-পানি খাইনে, তারা তিন জনে গপ-মারা-বুলাক্। তা-বনই-কান্দারা-কালামঙরে-পুসার-গরের-

"আঃ কালা-তুই-কি-ঘর-সংসার-ন-ধুরিবে-নে-?"

"বনই-মুই-কি-গুরিন-ক-না-?

"আমা আদামত সরলারে মনত্-পড়ে-নি ছা। তাত্তুন-জামাই-নাই। দ্বি-ইবা-ঝি-আ-হন্। উলুবিলই-ফুলবি। তা-জামাই-মুরিনে-তা-ভাই-ইয়-ঘরত আহে। সরলা বয়সে-তল্লই-উনিশ-বিশ উবদে। বয়সে-বেইত্ কম-ন-উব"।

"ঠিক-আহে-দ-বনই। তুমি-যুদি-কুলে-মুই-রাজী-আ-হং"।

"তত্তুন-মনত্-পুলে-কাইল্ল্যা চা-বঙই"। রেজনবি-কই-উদিল

"পারিবেনি কালা? সরলা যে, জানে্গন-। তরে-কদায়-কদায় উঠ-বইত্ গুরিব"। কান্দারা-কই-উদিল-

"কালামঙর-ভাগ্যোত থালে। কলামঙ্গ্যালই দোল-সংসার গুরিব-দে-ছা। মাইত্-ন-পাইত্বে-তুই"। রেজনি-কই-উদিল-

"খা-ই-চাওই-না-! গম-উলে-দ-গম"। রাইত-উয়ে-ঘুমত পুরি-য়ই-যেই।" পল্লই-পল্লই-কালা-য়েই-আমিয়্-দ্বি-জনে। তারা-গুদিত-সমালাক্-কই।

ফাউনর দিন বিল্ল্যা মাদান। কালামঙর লই-তা-বনই-কান্দারা দ্বি-জনে পুনা-পুইন্ন্যা গুরি-হা-দি-দন্। মুড়া-উন্-নানান-গাইছর ঘন গাইত-শালাবন। ঘন গাইছর-বনত্তুন, নানান-পাইচ-র-শুনের-কালামঙ্যা। র-শুনিনে কালামঙ্যা-মনত্-গাবুর-রঙ-ফুদিল। তা-বনই-পিছে পিছে-হা-দের। মনে-মনে-সরলারে-কল্পনা-গরের সরলা-দোল-উবনে-কালা-উব। তা-মু-য়ান দোল- মু-উবনে রাগকয়া মু-উব। বল্লা-উঠ্-উব-নে-পাদল-উঠ্-উব। তা-মনান-পাবনে-ন-পাব। ভাবিদে-ভাবিদে-তা-বনইয়ে-চাই-দে-তারে-ফেলাইনে বু-হু-ত-দূর-গিয়ে। কালাং-পিদত-বুইনে মেলা এক্কয়া-আইছেত্তে দে-হের-। মেলা-বা-আইদে-

আইদে কালামঙ্যার ডাগ পুষি-গেলগই। কালামঙ্যাত্তু সি মেলাবা দিইনে- মনত্ পু-ল। মনে মনে ভাবের-সরলা যুদি-ই-মেলাবা-দক্ষ্যা উ-ইদ। গম-উ-ই-দ। কালামঙ্যা নানান কদা ভাবিদে-ভাবিদে তা-বনই-ফেলাই যাইনে সরলাদাই ঘরত উদিনে-ইছরত বইনে গব্ দের। কালামঙ্যারে দিইনে-তা-বনই-কান্দারা ডায়ের।

"ও-কালা-ও-কালা-আয়-আয়-ইছরত-উঠ্ছি"।

কালামঙ্যা-তা-বনই-ডাক-শুনিনে সা-উত্-দি-য়া-পাইছং বাইত ধুরনে-উ-দি-লই। তা-বনই-কান্দারা-সরলা বড়-ভাই-য়া উর্জুন মুনিলই পরিচয়-গুরি-দে-র।

"ইত-ত্বে-ম-শালা-কালামঙ্যা। তারে সরলারে-মনত্-পড়েনি দে-য়া-আ-ইনঙগে। পয়াবা-কালামঙে খারাপ-ন-য়-দ। তা-বউবা বছরখানিক অ-তত্বে-মারা-পুইর্জ্যেদে। তাত্তুন-পয়া-শয়া-নাই। ঘর-বা ইতি-জ্বালাবার-মা-নইত্ নাই। মুই-কঙতত্বে সরলারে মনত পরে-নি চেই-য়ই। আঃ মনত্পুলে কদা-বার্তা-ঠিক গুরি-যাবং"। অ-জুন মনি-কই-উদিল-।

"সরলাত্তুন তা-ল্-লই-ঘর-সংসার গুরি-ব-নে-ক-নে-কুব। তাত্তুন-মনত পুলে-আমাত্তুন-মনত্-খুশী-লা-য়িব।" ভুজুনমুনি তা বউবা-সুন্দুরি মারে ডায়ের-

সুন্দুরী মা তুই-কুদি? আমা-সরলা ঘরত-আ-হে-দে-নে। সুন্দুরিমা-ইছরত তলে শুয়র-আদার-দিতে-দিতে কই-উদিল-সরলা-দ-কালাং-পিদতবুইনে-ক্ষে-দ-ছিন্দি-চন-তয়া-গিয়ে।

"সরলা-দ-কালং-পিদক গুরি-ক্ষেদ-ছিন্দি-না-যাত্ত্বে দিই-লুং। কান্দারা-কই-উদিল।

কালামঙ্যা সন্দেহ গরের। নিশ্চয়ম-ডাগপুষি গিয়েদে মেলাবা উব-দে। সিবা-সরলা-উলে-দ-ম-ভা-বনান-লই ঠিক-আ-হে।

বেলা প্রায় শেষ আদাম-মাইনস্যে-কামত্তুন, ফিরিদন গরু-মইষর-ঘুন্ডি-র-শুনা যার। অর্জুনমুনি-কই-উদিল-

"তুমি-থা-য়-আইচ্ছ্যা-রাইদত্ কদা-বার্তা-কু-বং।

"আমাত্তুন-ঘরত্-গেলে-দিসা-উবদে-দা"। কান্দারা-কুল

"না-না-ভাইলক্-আইজ্যা-ন-যাই-য়-নুনে-ভাদে-দি-বা খাবং-গে-য়াই। অর্জুনমনি-তা-মুগ্করা-সুন্দুরি-মারে-ডায়েব।

"সুন্দরি-মা-গরবাউন্রে-ভাত-চন-জোককাইদে-ই-না।"

"শুয়র-আদারুন-খা-হোক-আয়-চঙর-। সুন্দরী-মা-কুল-বেলান-ডুবং-ডুবং। অর্জুনমনি ভা-ইয়্-বউন-ইছরত উদিলাকছি। তা-য়ল-পুইলাং-মই-নে-কুম-ডায়ত-লই-লই কয়া-গাঙত্ যাইদন। সরলা-কালঙত-গুরি-চন-পাত-আনিনে পাক্ ঘরত-সমা-লই। অর্জুনমুনি-বউ বা সুন্দুরি মা-হাত-ধ-ইনে-পাক-ঘরত সমা-লই। কালামঙ্যা সরলাবে ইছরত্তুন পাক ঘরত যাত্দে-তা-চলন-ধরন-চাই-রইয়ে। মনে মনে ভাবের রেজনরি বে-যা-কুই-য়ে-সি-দগ-দ-তারে-দে-য়া-ন-যার। তারে-দ-মুই-গিরিত্তি গরে-দে-দগ-দে-য়ঙর। রাইত-উল-বে-য়াক্ষুনে

ঘরত আলাক। সরলার-উলবি-ফুলবিদাই-য়-আলাক। রাইদত্‌ ভাত-খাইনে আমি-গম মারা-বু-লং। সরলা কদা-উদিল-অর্জুন-মুনি-তা-ভাইওনরে-কুল-

"ভাইলক্‌-আমা-সরলারে কালামঙ্যালাই বউ দিবার কণ্ডতে-তুমি-কি-ক?

অজুনমুনি ভাই-য়ুন-কই-উদিল-

"দিসামুক্যা-ঘর-পাহ্‌লে-তা-ঘরান্‌-তারে ধুরি-দিলে-দ-গম-উব? সরলারে-ডায়িনে-পুসারগুরি-ছ-তে-কি-কয়।"

অর্জুনমনি-সরলারে ডায়িল-

"সরলা-তত্‌তুন-ঘর-সংসার-গুরিবার ইচ্ছা আহেনি-নাই-

সরলা ইছর মাদাত এক কনাত্‌তুন-কই-উদিল-

"ইচ্ছা-আ-হে-তুমি-দি-দে-রাজী-উলে-মুই-য়-রাজী।

অর্জুনমুনি-কান্দারে-পুসার-গইল্ল্যা-

"কান্দারা-বনই-কদা-কি-অ-ত্‌ত্বে?"

কান্দারা কই উদিল-

"সি-য়া-ন-দ-তোমা-ব্যাপার, তুমি কমলে কি-গুরিবা-তমাল্লই-কদা।"

অর্জুন মুনি-সমর মুনিলই-অমরমুনিরে-পুসার গরের-

"সমর,অমর-তুমি যুদি-রাজী-থা-য়-দে-অয়, সালে-আইচ্ছেত্বে-নয়া চাঁনত্‌ পূর্নিমা-ভূদূরে-ভরা-চানত্‌-সরলারে-বউ-দিই-ফেলেই। তুমি-কি-ক?

তারা-দ্বিভাই-য়ে-কই-উদিলাক-

"উ-য়ে-না-সি-য়ান-উলে-গুরিবং-গে-য়াই।"

কদা-কুইদে-রাইত্‌-বেইত-উ-য়ে। অর্জুন মুনি-বউ-বা-কই-উদিল-

"ভাইলক্‌-রাইত্‌ ভচমান্‌-উ-য়ে, -য-য-ঘুমত-পর-অই-। কান্দারালই-অমরমুনিদাই কই-উদিলাক্‌-

"হয়-হয়-বে-ইত-রাইত্‌-উ-য়ে। যেই-ঘুমত পুরি-অই। বেককুনে ঘুমত পুরিবার গেলাক।

ঠিক-গুইর্জ্যা দিন তারিখত্‌-কালামঙ্যা সরলারে বউ আনিল। কালামঙ্যা গুরীব-মা-নইত্‌। দিনে-কামাই-দিনে খা-না-। অভাব-সংসার। দিলি-মজুরী-গুইতত্বে গুইত্বে সরলা ব-র-মাদা-ড়ীড়া-বাচা-ল। রাইতদিন-যন্ত্রনায়-কে-নে থাব। থ-য়ায়-ন-পায়। কালামঙ্যা কয়েক-পীড়া-বৈদ্য-ধুরিনে-নানান-ঢালি-কমা।-নানান-দারু-তাবিদ-দিল। কোন-কিছু ন-অয়। সরলার মাদা পীড়ান গম-ন-অয়। একদিন-কালামঙ্যা আমছড়ি মুইনত কাম গুরিবাল্লাই গিয়েদে সি আদামত্‌ লন্দোমুনিরে-লাগ্‌-পা-ল-। লন্দোমুনিলই-দু-য়-সু-য়-কদা-কুই-দে-কুই-দে-সরলার অসুখ-কদা লন্দোমুনিরে-কালামঙ্যা কু-ল-। আমছড়ি আদামর তলেদি আদামনত্‌ রসক বৈদ্যা-নামে বৈদ্য। এক কয়া আ-হে। কালামঙ্যা

লন্দোমুনিত্তুন বৈদ্যয়া ব্যাপারে-বে-য়াক্খান্ জানি লুল। বে-য়াক্খান্-জানি লইনে কালামঙ্যা একদিনা-রসক বৈদ্যরে ডানেই-আনিল। রসক বৈদ্য সরলারে কুল

"ত-পীড়ান-দ-ঝি-গারো পীড়া-তরে-চাইদে-দ-ভালুকদিন লাইব-সী-নাইন-গড়াপুরিব। পূজা দেয়া-পুরিব।"

সরলা বৈদ্যয়া কদা শুনিনে-টেংধুরি-সালাং-গুরিনে-ক-র-

"কা-ক্কা-তুই-ন-ধর্ম্মিত্ত্ব বাপ-আইছ্যাত্তুন-ধুরি-তুই-ম-বাব-মত্তুন বাব-নাই-মা-য়-নাই। মুই-অকুলত্-ভাসি-আহঙগে। তুই-মরে-উদ-দার-গ-র-ম-বাবা। মুই-ত-হাদত মুক্ত-

উ-ইন্দে, মুই-ত-হাদত-মুক্ত-উ-ইনদে।"

রসক বৈদ্যয়া মনত্ এক্কেনা মায়া আল। সরলারে-মিনাইন হু-ইতে-ঢালি, পূজা দেয়া শুরু গইল্ল্য। প্রায় মাসখানিকর-মধ্যে-সরলা গম-অয়-উদের। রসক বৈদ্য সরলাদাই ঘরত থাইনে-বে-য়াক্-জা-গাত্তুন রোগী-চা-র। রসক বৈদ্য সরলারে চিকিৎসা গুরিনে-গম-নাম-দারেরা-বা-ইরে-রোগীরে-তে-গম গরার। কোন-পাড়াত্তুন এককয়া গাবুর্জ্যা রোগী রসক বৈদ্যায়ারে থ-য়াইনে-আ-ল-। গাবুর্জ্যা রোগী-বা-রা-জা-পয়াদগ-তারে-গম-গুরিনে-উলবিলই ভূ-দুজ্যা মন্ত্র দিইনে-সি-গাবুর্জ্যালই উলবিরে বউ দিই-দিল। উলুবি-ভাগ্যাভালা-তা-ল্লই সুয়ে সংসার-গরেললই। রসক বৈদ্য-মনান খুব খারাপ। মেলা-রোগী-উন্রে বা-না-পেট-তা-নি-দেনা। একদিনা গাবুর্জ্যা মগ-মেলা রোগী-এক কয়ারে আনিলাক্-কি বলে-রো-য়া-ঙা-ভূদে ধইজ্যে। দিনত উলে গমে-কদা-চলা-ফেরা গরে। রাই-ত্ উলে ভূদে পায়। বৈদ্যয়া পু-ত্ত্বি-রাইদ-আন্তারত-তারে-মন্ত্র পুরি-পুরি-কি ছাক্ কারাই-হয়। আ-মা-নরে-বৈদ্যয়া কয়দে রোয়াঙা ভূ-দ ভারী-অলক্ষী-অ-জা-ত্ থান্দে। তারা নরে ডা-বা-ই-দেদি-রী-লাইযে। প্রায়-ছয়-সাত দিন-উল-পু-ত্ত্বিদিন এক দগ-কেয়া-গরে। এক দিনা বিইন্যা দুরত্-মুই লই গাবুর মং মেলা রোগী বাললই ঘরত আহি। বৈদ্যয়া মং মেলা রোগীবারে-মুই-ঘুম-যাঙে-গুদিত ডাই-নিল-মুই-বে-ড়া-কানা-বে-দানাদি-জুইতগুরি-চা-য়-র-ই-য়ং বৈদ্যয়া--মং মেলাবারে কি চিকিৎসা গরে। রসক বৈদ্য মং- মেলাবারে-লাম্বা-গুরি-পরিবার-কুল। বৈদ্যয়া তেল শিশিরিত্তুন হাদত তেল লইনে মন্ত্র-পরা-ধুইল্ল-। মন্ত্র পরা-শেষ-হইনে-তা-দ্বি-হাদ-পাদাত-তেলান-লইনে-দ্বি-হাদ-পাদা-লই-ডুলিল-। গাবুর্জ্যা-মং-মেলাবার-দায়দ-বইনে-তা-ব্লাউশর-ভুদুরে-হাতটান্-দিইনে-বুকয়া-চিবিদের পুষিদের-। বুকয়া-তলেদি-তলপেদর-তলেত্তুন-ধুরি-রা-ন-গড়াত-পুষিদের। চিবিদে-পুষিদে-রোগীবা-লঙ্গিয়ান্-খুলি-দিল-বৈদ্যয়া-মনান-খারাপ-উল-। রোগীবার উবরে-উদিবার-কোশল-গরেত্ত্বে-রোগীবা-বৈদ্যয়া-দগ-দিইনে উদিনে-ইছর-মাদাত্ এক কোনত্-হেলান দিইনে ভালক্কন-মনে মনে কানিল। বৈদ্যয়া-মং-মেলারে-ছাড়িনে-পাড়াত-রোগী চাবার-গেল। বিল্ল্যা-মাদানত্-রোগীবা-মা-বা-আল। মাবারে-রোগীবা-বৈদ্যয়ার-ঘটনান্-বুঝাইয়ে- ।রোগীবা-মা-বৈদ্যয়ার উবরে-রাগ-উল-। রোগীবা-মা-বা-মরে-ডাইনে-বৈদ্যয়ারে-পুষার-গরের।

"মা-দু-মা-দু-বৈদ্যয়া-ক-রে-যাইয়ে"-?

"বৈদ্যয়া-রোগী-চাই-ত-লাই-যাইয়ে-মা-মী-।

"এক্ কেনা-ডাগিদ্-পারিব-না? মুই-বৈদ্যয়ারে-ডাই-আনিলুং-। রোগীবা-মা-বা-বৈদ্যয়া-মুসুঙে-বই-নে-কুল-ন-গুরিব-। বৈদ্যয়া-কই-উদিল-.

"রোগীবা-ত-ভালা-ন-হয়-মামী? কে-মেনে-লই-যাইব-।

রোগীবা-অসুবিধা-হু-ইলে-আমি-দোষত্-পুরিব-যা"-।

"ন-ই-বো-ন-ইবো-আমি-লই-যাইব-গই।

রোগীবা-মা-বা-তারার-কাবর-চোবর-বুদিবা-লই-ইছরত্তুন লামি-গেলাক।

বৈশাখ-মাইস্যা-খরান-। দুবর্জ্যা-খরানত্-আমি-আম-কুরুয়া-গুরিনে মুই-খুড়ী-তা-পয়াক,-উলুবি-বেলই-সমারে-খালং। খুড়ীদাই-গেলাক্-গই। বৈদ্যয়া-পাদি উবরে-ইইনে-তাবিদ-বানার-মুই-ম-গুদিবাদ-পুড়ি-রইয়ন-।-খাদিক্ষন-তাই-ম-পেট-তয়া-মুচুরি-উদিল-। পরেদি-পেট-তয়া-পীড়া-গরের। খুব-অঃং-গুরি-সায়-চালুং-ন-পারঙর-বৈদ্যয়ারে-ডাইলুং-"ওঃ-দা-ওঃ-দা-ম-পেট্তয়া-পীড়া-গরেত্ত্বে-"। বৈদ্যয়া-কুল

"খা-না-আম-কুরুয়া-। দে-থাক্-হাককন্-।

মত্-তুন-পেট-পীড়া-আরও-বাড়ের-থা-ই-ন-পারঙর।-ফুলো-ফালা-বাইত্-মাদঙর-। ভাই-দে-ডাইয়ে-বৈদ্যয়া-আ-ল-। মনে-মনে দরাঙর। গাই-গাই-মুই-। মং-মেলাবা-দগ-উলে-দ-শে-দ। ইন্দি-পেট-পীড়া-ল-লাই-থাই-ন-পারঙর-।ম-ছায়ত্-বইনে-পেট্তুয়া-নাঁ-য়ীবাত্-বুইজ্যা-আঁ-উল্দি-চিবি-চা-ল। এক-চি-বানে-মুই-আধা-মরা-। হাদত্-তেল-লইনে-মন্ত্র-পুড়িনে-তল-পেদুত্তন্-ধুরি-শুরু-গুরি-বুক্ছং তেল-গুলি-দিল। বৈদ্যয়ার-তেল-গুলি দেনার-দগ-কান্দি-ম-পেট পীড়া-গরের-নে-ন-গরের-মাইত্-ন-পাঙর। তা-হাদ-ছয়ায়-ম-গদা-গেয়ান-ৎ-মুরি-উদিল। ম-গেয়ানত্-অন্য-দক্ষ্যা-শিহরণ-জাই-উদিল-। বৈদ্যয়ার-হাদর-ছোঁয়ায়-পেট্তয়া গম-অইনে-ম-রে-মন-পীড়া-তুলি-দিল। বৈদ্যয়া-ম-দগ-দিইনে-কই-উদিল

"লক্কোবি-ইক্কিনা-কে-ইন-লা-য়ের-। গম-লায়ের-নে-? আঃ- পুড়ি-দিদুং-মন্ত্র"? বৈদ্যয়া-কদা-শুনিনে-মাদাত্-লো-উদিবার-অ-ক্-ত-উয়ে। বৈদ্যয়ার-প্রতি-ম-মনত্-ঘীন-আ-ল-। বৈদ্যয়ারে-কুলুং-

"পেট পীড়া-ন-গম-হইনে-ম-রে-গে-য়া-পীড়ান্-তুলি-দিলে-

"তুই-গাবুর-মেলা-দ-লক্কোবি-সি-য়ানে-ছা-ত-পেয়ান্ পীড়া-উ-য়ে-দে। কিচ্ছু-ন-উব-দে-লক্কো। বৈদ্যয়া-মনে-মনে-কুন্-কনাই-কুনকুনাই-বারান্দাত্ তাবিদ-বানা-বইচ্ছেছি।

বৈশাখ্যা চতুরদর্শী চানান্-। ফুক-ফুক্যা-জুন-প-র-আদামর গাবুর্জ্য গাবুরীদল আমা-ছিদি বে-ড়া-আলাক্-রাইদ-সম্ভাগ-নানান-রঙ-দঙ-গুরিনে-তারা-গে-লাক্। মুই-ম-গুদিত-ঘুম-গেলুং। গেল্লে-রাইদত্-আ-মা-রঙ-দঙ-দিইনে-বৈদ্যয়া-ম-রে-থে-ছে-রা-গরের-

মুই-অ-বৈদ্যয়ারে-দ্বি-এক্কান্-ড়-কদা-কই-দিলুং। বৈদ্যয়া-ম-ম-উবর রাগ-। বৈদ্যয়া-ম-মারে-কি-শুনাই-য়ে-কি-জানি-মা-ম-উবরে-ক্ষেপ ধুরিনে-আহে-। ম-দোইত্-ধরে।

বৈশাখ মাইস্যা-রইদ-গরমত-ম-মা-মরে-আদা-কুচা-নিল-। রোই-দে-রোই-দে-আদা-কুচিনে-মত্তুন-জ্বর উদিল। গেয়াঁন-গরম-। ঘরত্-আ-হন-নে-মদিত্-আ-হ-ন্ কই-ন-পারঙর-।-মা-গেয়ান-ধুরি-চা-ইনে-বৈদ্যয়ারে-কু-ল-

"বা-বা-ফুলবিত্তুন-জ্বর-উচ্ছেদে-। তারে-দারু-জন্ম-থালে দিই-দিত্। আমি কামত্-যে-ইর।

"আ-ইচ্ছা-আইচছা-দারু-দিন্দে-য়াই। তুমি-য-গইনা-ত্মত তুই-আহন-দ-মুই-ফুলবিরে-চা-ইন।" বেয়াক্নকুনে-কামত্-গেলাক্। মত্তুন-মদাক-চু-লাত্-তে-উদি-বই-ন-পারঙর। গেয়াত্তুন-ঘাম-নি-রের-গেয়ান-এমন-ঘাম-নিরের মেন-কত্ত্বে-গেয়ার-কাবর-খুলি-পেলাই-সেনে-বাদে-থাং। বৈদ্যয়া-মরে-ডাহি-ডাহি-সমারছি-

"লক্কো-লক্কো-গেয়ান-কি-দগ-প-ত্-ত্বে-? ঘা-মত্ত্বেনে"? কান্চাবাকুড়ে-আইনে-বৈদ্যয়া-তা-গামছাদি-ম-মাদা-ঘামান পুচি-দিল। গলাত্তুন-ধুরি-বুককয়া, পেট্তয়া-তলপেদর-রানতলেদি ম-ঘামান পুষি-দিল। মুই-সহ্যয় গরঙর-আরামপাঙর। ঘামা-ন-পুঁচি-দিইনে-এক-কয়া-বুরি-কুত্ট্টাত্তুন-পানি-লইনে-খাবা-ল-। কুদুর-তেল-হাদত্-লইনে-মন্ত্র-পুড়িনে-ম-মাদাত্-দিই-দিল। তে-লান্-মাদাত্-দিইনে-ম-মাদা-ভুদুরে-এমন-জুরাই-যার-বেয়াক্-মাদা-পীড়া-লাং-হ-র-। লা-রে-গুরি-মত্তুন-ঘুমে-ধু-ই-ল্ল-।মুই ক-দক্ষণে-ঘুম-গেলুং-খবর-ন-পাঙর। সি-ঘুমুত্ মুই-স্ব-বনে-দেয়ঙর।-

বিরাট-সা-গর-। সা-গর-পা-রত্-মি-ইল্ল্যা-বালুচর। বালু-চরত্-কোন-প্রানী-নাই-। সাগরত ধুধুপ বড়্-বড়্-জ্যা-ই-ত-ভাসিদন্-। মুই-বালূচরত-বেড়াই-দে-বে-ড়াইদে-এককান্-ধুপ ন-লই-বৈদ্যয়ারে-দেয়ঙর। ধুপ-ন-য়ান্-দি-সাগরর-বালু-চরত্-আইসেত্-ত্বে। বৈদ্যয়া-যে-দিই-নে-মরে-ডায়ের। তা-ধুপ-ন-উদি বাল্লাই-মুই-তারে-দিইনে-গেলুং-।-ন্-উবুরে-উদিলুংগই।-ন্-আন্-সাগরর কুলত্তুন দুরত গেল। সাগরত্-তলই-বনা-দক্ষ্যা ঢেউচাক্-আইসেতত্বে-আমা-ন-আন-ডুবি-যার-। বৈদ্যয়ারে-থোয়াই-ন-পাঙর। মুই-সাগরত্-ঢেউ-চাক্লই-একবার উদঙর-এক-বার ডুবঙর। কুল-ধুরিবার-চা-ঙতে-ন-পারঙর। বৈদ্যয়া-মরে-আচা-গুরিনে-তুলি-আনিল। কুলত্-উদিনে- বৈদ্যয়ারে মুই-এত দোল-দেয়ঙর-যে-ন্-হিন্দি-সিনেমার নায়গ-দগ। পিইন্-ন্যা-কাবর-চোবরানি-ধু-প-। আদিক্ষ্যা গুরি-ইছরত-গুরুং-গুরি-কি-ক্ থু-লাক-ম-ঘুমান্ ভাঁ-য়ি-ল-। পরানান-দুগ-দুগ-গরের-কি-স্ব-পবন-দিই-লুং-। স্বব-ন-কদা-ভা-বিদে-ভা-বিদে বৈদ্যয়া-ডায়ের-

"লক্কোবি-ত-গেয়ান্-জুরাই-য়ে-দে-নে? বৈদ্যয়া-র--বা-শুনিলে-ম-মনান্-আ-রেক-দক্ষ্যা-উ-ল। স্ব-বন্ত দিক্ষ্যা-বৈদ্যয়া-চে-য়া-রান্-মনত্-উদিল। মনানে-ক-তত্বে-বৈদ্যয়ারে-চা-ই-দুং।

পরে-দিনা-ম-জ্বর-কুমিনে-আদা-কুচা-গেলুং। আদা-কুচিদে-কুচিদে-স্ব-বনত্-দিক্ষ্যা বৈদ্যয়ার-চে-য়া-রান্-ম-নত্-উদে। মনে-মনে-বৈদ্যয়ারে-ন-দি-ইলে-মনান-ন-জুড়ায়। বা-

না-বৈদ্যয়ারে-চা-বার-মনে-কয়-বৈদ্যায়ারে-দি-ইলে-ম-পারানান্-জুড়াই-দে-দগ-পাং। মত্তুন বৈদ্যয়ালই-সমারে-বেড়াবার-মনে-কয়-বৈদ্যয়ারে-ন-দি-ইলে-মত্তুন-মনত্-গম-লা-য়ে। মোট-কদা-বৈদ্যয়া-ছাড়া-এক্কেনা-য়-গম-ন-লায়ে। জেইত-মাইস্যা-দিন-। ঘর-কা-ম-পু-রা-য়ে-। বৈদ্যয়া-মরে কুল-
"লক্কো-লক্কো-আমা-ঘরত-বে-ড়া-বঙগই-দে-। -ঘরত্-ত-বেই-দাই-আ-হন্-। আই-সেত্ত্বে-পুরশু-হো-ক্-তুরশু-হোক আমা-ঘরত্-বে-ড়া-বঙগই। বৈদ্যয়া-কদা-শুনিনে-মুই-য়-হি-কু-লুং-। দি-দিন-বাদে-বৈদ্যয়া-লই-মুই-তারা-সিদি বেড়া-লা-মিলুং-। বৈদ্যয়া-দাই-ঘরত-আন্-তার-আন্-তার-উ-য়ে-লুমি-লংছি। বৈদ্যয়ার-দাঁয়র-মুগকরা-ইছরত-। বই-আ-হে। চিয়ন-মু-গকয়া-ভাত-চন-রানের-। দাঁয়র-মুগকুয়া-মে-রে-য়া আড়ান্-লই-চা-মান্-। চিয়ন মুগকয়া-গে-য়া-আ-হে-। ঘরর কারবার-তা-হাদত্-। চিয়ন মুগকয়ার-চার-ব-ছর-মরদ-পয়াবা-গাই-গাই-ব-ইনে-খেলের। রাঙ্গী-দত্-ভাত-খাইনে-বৈদ্যয়া মুগ-কুন-যার-যার-বিছানাত্-ঘুমত্-পু-লাক-কই-। বৈদ্যয়া মরে-জুদা-গরি বিছান-গরি-দিল। রাইদ-অধেয়ত্-বৈদ্যযা-ম-বিছানত-আ-ল। বৈদ্যয়ারে-স্ব-বনত্ দিক্ষ্যা-দগ্-কান্-মনত্-উ-দিল-। মুই-চুপ-গুরি-ভা-বঙর-। ম-দায়ত-পুরিনে-পয়লল্যা-ম-বু-য়দ-হা-ত-টান-দিনে-ম-বুগকয়া-বি-চি-রার-। ম-গে-য়ান্-সৎমুরি-উ-দিল-বৈদ্যয়া মরে-আ-দা-ম-সাবে-শি-য়ার-ধরন্-দে-দক্ষ্যা-গুরি-ম-টেঙ্গত্তুন্-ধুরি-পে-চাই-পেচাইবে-রাই-ধরের-।-ম-গেয়ানত্ কাম-রাগ-জা-ই-উ-দিল। পইল্ল্যা-যৌবনর-ফুলুন্-বৈদ্যয়া ফু-দাই-দিল-। ফুল-উবরে-উ-দিনে-ভোমরে-মধু-খা-ল-প-ইচ্ছ্যা-কুয়া-ডা-য়-আ-গ-দি-বৈদ্যয়া-তা-বিছানাত্-গেল-।-ম-রে-বিছানাত্-ফেলাই-গেল।-মর-ঘুম-ন-ধরের-। চিদা-গরঙর-। বৈদ্যয়া-মরে-কি-গু-ইল্-ল্য। বৈদ্যয়া-কদা-ভা-বিদে-ভাবিদে-বিন্যা-প-র-উ-ল-। বিন্যা-প-র-উ-ইনে-চিয়ন-মুগ ক-য়া-ভাত-চন-রানের-দাঁ-য়র-মুগকয়াল্লই-দি-জনে-কঁয়া-গাঁ-য়ত্-গেলং-মর-হা-দানা-দগ্-দিই-নে-বৈদ্যয়া দাঁয়র-মুগ-কয়া-কা-ইল্যা-রাইদর-ঘ-টনান্-থা-য়-র-পাই-য়ে। আষাঢ়-মাই-সর-হাল-পা-লা-নি-দিন-। ক্ষে-দত্-তুন্-ন-য়া-চন-পাত-তুলিনে-লু-ক্ষী-মারে-মা-ভাদ দে-য়-। হাল-পালানি-দিনা-উলুবি-বে-ড়া-আ-ইচ্ছ্যো-। ঘরত-উ-লুবি-কইন-ভাদ-রানিল-। আদামর-মং সমার্জ্যা-গাবুর-লক্-কুন্-আমা-ঘরত্-উ-দিলাক। তা-রাল্-লই-সমারে-কইন-ভাদ-খা-লুং-। -ম-সমাইর্জ্যা-য়ুন্-সমারে-বেড়া-ডা-য়ি-লাক্-ম-গেয়ান্-গম-ন-লা-য়ের। তা-রা-গেলাক্-মুই-ন-গে-লুং-মুই-ই-ছ-র-মাদাত্-বই-নে-অ-লং-অ-লং-গরঙত্বে-উলুবি-দি-ক্-খে-।-ম-গে-য়া-ন্-গম-ন-লা-য়ে-ত-ত্বে-। গুদি-বি-ছা-নত্-পুরি- র-ইয়ন-। উলবি-ম-দগ-দিইনে-ম- গুদিত্-আ-ল-। -ম-পু-সার-গরের-
"ফুলবি-ফুলবি-ই-মা-ইসত্-তুই-কাবর-ধু-ইয়ত্-তেনে?"
"আই-চ্ছ্যা-দি-মা-ইত্-বে-কাবর-ন-ধঙ-গে"-। মুই- উলুবিরে-মুই-বৈদ্যয়ার-বে-য়াক্-ঘটনান্-কুলুং-। উলুবি-মারে-ম-ঘটনা-কদা-কই-দিল। শুনি-নে-মা-মরে-ইট্-টুক্-আ-ট্-টাক্- গাল-শুনাল-। মা-ত্তুন-চিদা-নাই-তা-বা-ব-য়া-বৈদ্যয়া- মরে-গম-গুরিব-।

আষাঢ়-মাইস্যা-ঝড়-দিন-। মা-দা-নি-রাই-ন-পারে। ঘরত-মাইনসে-কামত-গি-য়ন্-। ম-অসু-গ-কদা- মা- বৈদ্যয়ারে-কু-ইয়ে-। বৈদ্যয়া-তা-বৈদ্যালী-কুল্ল্যাবাত্তুন

চিয়ন-ব-ইয়াম-খুলিনে-কালা-ঝুরি-দ্বি-বা-দিল-। -মুই- বু-রি-দ্বি-বা-খা-লুং-। দা-রু-খাইনে-বৈদ্যয়া মরে- ডা-য়ের-মুই- তা-সি-দি-আলুং-। মরে-লা-ম্-বা-গু-রি-পুরিব্যর কু-ল-। মুই-লা-ম-বা-গুরি-পু-রি-লুং-। বৈদ্যয়া-হা-দত্- তেল-ল-ইনে- মন্ত্র-প-ড়া-শুরু গুইল্ল্য। প-ড়া-শে-দ-অ-ই-নে- ম-নাঁ-য়-বাত্-বু-ইর্জ্যা-আ-যুল্লয়াদি-এমন-ম-চ-রান্- দিল-ম-পেদত্- ভা-ড়াল্-আ-দুরি-উ-লট্-পা-লট্-উল-। মন্ত্র-পু-ইর্জ্যা-তেলদি- ম-ত্-ন- পে-ট্টায়া--মুলি-দিল- পু-ষি দিল-। মন্ত্র-পু-রি-পু-রি- ঝা-ড়ি- দিল-। পে-ট্টয়া পুষি- দি-ইনে-ম-তল-পে-দ্ত-শু-লানি-শুরু-উ-ল-। প-রেদি- এমন- কা-মু-ড়ি- শুলানি-শুরু উ-ল-মুই- ঘরত্ থা-ই-ন-পা-রঙর-। বূ-বূ-গুরি-দে-বা-বা- ঝড় দের-। বারিত্তিন-মা-দা-নিরায়- ন-পারে-। এমন-কা-মুড়ি-শুলানি-শুরু-উল-। আর-থাই-ন-পারঙর-। জুমুর-মা-দাত্-দিইনে- ঘ-র-কনাত্-ইছর মাদাত বই-নে- ম-পেট্-তয়া- সাফ- গু-ই-ল্লুং। ই-ছরত্-তলে-দে-য়ঙ-তে- বা-না- লো- পানি। গেঁ-য়া-ভাঁ-য়ি-লো-যার-ঘন-ঘন- তিন/চার বার-যাইনে-মুই- দূ-র-বল্- উ-লুং- বৈদ্যয়া-মরে-চাই-নে- ভাত-কুচ-রিনে ভাত-পানি-খা-বা-ল। ভাদ-পানি-য়ান-খাইনে-এক-লেছা-ঘুম-গেলুং-। ম-গে-য়ান্- দুর্বল-মুই- ঘরত-থাং-। বৈদ্যয়া-ম-ডায়দ-আ-ইছে- নরম-নরম-কদা-কয়-। ধুরিনে- আদর- গরে-। মুই-বৈদ্যয়ারে- কিচ্ছু-কই-ন-পারঙর।

ভাদ-মাইস্যা-রইদ-। রইদত্-কাম- গুরিনে- জ্বর- উদিল। মা-বৈদ্যয়াত্তুন-দারু-ল-ই-দিল। দারু-খাইনে গম-লায়ের-। কামত্-ন-যাং-। বৈদ্যয়া-তাবিদ-বানার-মুই-ম-গুদিত্-পু-রি-রই-য়ঙ-। বৈদ্যয়া-ম-গুদিত্-আল। মুই-ঘুম-সল-ধুরি-আ-হং-। ম-ডায়দ-পুরিনে-মরে- ম-লের পুরা-ম-গেয়ান্-কামনার-শিহরণ্-তুলি- দিল-। সাগরর উ-বক-জাবক-ঢেউ-দক্ষ্যা-মত্তুন-যৌবনর-ঢেউ-উ-দি-ল-। বৈদ্যয়া-ঢেউ-য়র-তালে-তালে-উদের-লামের-। পরেদি- বৈদ্যয়া-বল- পুরিনে- ঢেউ-য়ান্- থা-মি। মুই ঘুম-গেলূং-।

আশ্বিন মাইস্যা দিন-জুমত্-চন্-থ-য়া-গেলুং-। মুড়া-বেড়াইদে-বেড়াইদে-ম-মাদা-ফা-ই-উদিল। হাক্কন বু-লুন্-। মাদাত্-হাদদি-রই-র-ইঙ-। বুমি-বুমি-ভাব- লা-য়ের-। বুমি-গুরিবার-চা-লুং-। না- বুমি-ন-অ-য়-। মনত্-চিদা-উদিল। ভা-বঙর আ-গে-দক্ষ্যা-পাঙর-। আ-র-দারু-খা-পুরিব-। আ-র-দুঃখ-উ-ব-। উ-দিনে-চন-থ-যায়-লু-লুং-। ঘরত-আ-ইনে-ভা-বঙর- মা-রে-ন-কইন্-বৈদ্যায়ারে-কইন-দে- দা-রু-দি-বাল্লাই বৈদ্যয়া-তাবিদ-বা-নার। বৈদ্যযারে-কুলুং-

"দা-দা-গে-ল্-লে- বার-দক্ষ্যা-মর-উ-য়ে-। কি-গুরিন- মুই"-।

দারু-খা-লে-গম-উ-বে-দে-য়াই"-।

"মুই-দারু-খা-ই-ন-পা-রিন্- দা-রু-খা-লে-দু-গ-পা-ঙ"

"তে-কি-গুরি-বে"-।

"তুই-জা-নই-ত্"-।

"প-য়াবা-মর-উ-লে- মরে-লই-পা-বে"-।

"তত্তন্-ঘরত্-দ্বি-বা-মুগ-মুই-ত-রে- কে-নে-ল-ইন্"-।

"ঠি-গ-আ-হে-ম-রে-ন-লু-লে-মুই- জা-মাই-থ-য়াই-দি-ন্"-।

"মুই-জা-মা-ই-য়-লুই-দুং-ন-য়- ব-উ-য়-যাই-দুং-ন-য়"-।

"ছা-লে-দা-রু- খা"-।

"দা-রু-য়-খা-ই-দুং-ন-য়-। এ-নে-ঘ-রত্-বি-ত্-খা-ই-মু-রিন্-দে"-।

আশ্বিন-মাই-স্যাদিন-। ঠা-উ-রু-নর-ও-য়া-শেদ-অ-ই-নে-। ক্যয়ঙে-ক্যয়ঙে-কুঠিন-বীবরদান- চ-লের-। বৈদ্যয়া-দাই-আদাম-ক্যায়ঙত্- কুঠিন চীবর-দান-উ-ব-। মরে-তা-রার- ক্যয়ঙর- কুঠিন-চীবর- দানত্-নিল-। বৈদ্যয়া আদামত্-বউ-মরা-রানা-মরদ-এক কয়া লই-কদা-ক-য়া-দিল-। রানা-মরদ-ত্তয়ারে-গম-লা-য়ি-ল-। রাই-দৃত-কদা কুলুং-। বি-ন্যা-ক্যয়ঙত্-গেলং-। কেয়ঙত্-মেলা-বইচ্ছ্যো- তিন্-পা-ড়াত্তুন-গাবুর্জ্যা-গাবুরী- সমারে- বে-ড়াই-দন্-। রঙে-দঙে-চু-লি-দন্-। ম-কবাল-খারাপ-তা-রা-দক্ষ্যা-মুই-দ-চুলি-ন-পারঙর-। বৈদ্যয়া-মরে-রানা-মরদ-এক-কয়া-লই-ব-ড-দিবার-চা-র-। কি-জানি-ম-ক-বালত্- কি আ-হে-। কুঠিন-চীবর দান শে-দ-অ-ই-নে-ঘরত্-আ-লং-। বৈদ্যয়া- ঘরত-আ-ইনে-ম-মা-বা-বরে- কদান্-কু-ল-। আই-ছেত্ত্বে চাঁনত্- মরে- ব-উ-দিই-দিব। ঠিক্-ঠিক্- নয়া চাঁ-নত্ মরে-বউ-দিলাক। মুই- জা-মায়র- ঘরত- গেলুং-। ম-জামা-য়- ঘ-রান- ভাঁ-ঙা-। ই-ছ-রান্-ভাঁ-ঙা। ঘর- বে-ড়া-উন্ বে-দ-বান-ছি-নি-নে গু-ছাং-অ-ই-য়-ন। ছ-ন-চাল-। ছ-না-ন-পু-চি-যাইনে-রাইদত্-উ-লে চাঁন-তারা-দে-য়া-যায়। নিজ- কর্ম-য়ান্-ভাবিনে-ধৈর্য্য ধুরি- সংসার- ঘ-রঙর-। দিন- যার- মাইত- যার- ম-গে-য়ার দগ- পু-রি-ব-র্তন- অ-র-। দিন- দিন-ম- তল-পেট-দে-য়া যায়-। এক দিনা-ম-জামাই-য়ে-ম- গর্ভর- ক-দা- পু-সার লু-ল-। মুই-মিছা-কদা-ন-কুলুং-। ই-ভা-বৈদ্যয়া-প-য়া-। শুনি-নে-ম-জামাই-য়ে- মরে- ভা-লক-কন-ধুরি- অ-কদাদি-গাল-মন্দ-কু-ল-। তাত্-তুন্-গাল-খা-ইনে- মুই-মা- বাবর- ঘরত্- আ-লুং-। মা-রে- বে-য়াক্-খান্- কু-লুং-। মা-বৈদ্যয়ারে-ম-কদা-কই- দিল। বৈদ্যয়া ম-রে-ডা-ই-নে-কুল-

"কোন-চিদা-ন-গু-রিত-মুই-ঠিগ-গুরিন্-ত-জামাই-য়রে"-। সাপ্তাহ- প-ন-দর-দিন-থাংইনে-। বৈদ্যয়া- ম-জামাই-য়-ঘরত তুলি-দিলই-। মুই-ইক্ষিনা-গম-উ-ই-য়ং-। ম-পে-দত্-প-য়া নাই। ম-জামাইয়য়ে- মরে-কিছু-ন-গরে-কিছু-ন-ক-য়-। দুই-তিন- বছর- পার-উল-। মত্তুন- পেদত্-গর্ভ-ন- ধরের। জামাই-ব-উ-দ্বি-জনে- না-নান্-দক্ষ্যাগুরি-চালং কোন-ফল-আমি-ন-পা-লং-। মুই-ভ-গ-বা-ন-সিদি- বি-ইল্ল্যা-বি-ন্ন্যা- বন্দনা- গরঙ-। ম-কুলত্- এক কুয়া- প-য়া-আ-ই-দ। ও-ভগবান- 'মর'- কি-কবাল- খা-রা-ব- ম- পে-দত্-তুই- যে-ক্কে-নে- দি-লে- সে-ক্কেনে-মুই-ম-প-য়ারা-ইং-ন-পারঙ ও ভগবান। ইক্ষিনী-লা-য়েতত্বে-মুই-ন-পাঙর। ম-কর্ময়ান্-এ-দব্ক্যা- খারাপ- উলদে। ম-কর্ময়ান্- বৈদ্যয়া-খা-রাব-গু-রি-দিল-দে-। মুই-বৈদ্যায়ারে অবিশা-ব দে-য়ঙর। জন্মে-জন্মে-তুই-মুনিষ্য-কুলত্-ন-আ-ই-ত। ম-কর্ম-দোই-ত্-ভা-বিদে-ভা-বিদে-ম-দ্বি-চো-য়-পানি-পানিয়ে-বা-ই-না-ন্-বি-ছি-গি-য়ে।

লেখক : সংস্কৃতি কর্মী, ওয়াগ্গা, কাঠালতলী, কাপ্তাই।

উপহার

- রূপালী তঞ্চঙ্গ্যা

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির অপরূপ নীলা সৌন্দর্যে ভরা সে গ্রামখানি। চারি দিকে দেখা যায় শুধু ছায়াময় গাছপালা আর দেখা যায় বসন্তের কোকিলের শব্দে সীমাহীন আনন্দ ও শান্তির উৎস। সে গ্রামে বসবাস করে এক সুন্দরী, নম্র, ভদ্র মেয়ে। তার নাম মিতা। তার গ্রামের নাম আনন্দ পাড়া। বাবা-মা'র একমাত্র মেয়ে। তাদের সংসার ছিল খুব সুখী। কিন্তু হঠাৎ ছোট বেলায় মিতার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার বাবা হার্ডএর্টাক্ হয়ে মারা যায়। তারপর থেকে তাদের সংসার এক দুর্ভিক্ষের পরিণত হল। তখন থেকে তাদের সংসার অনেক কষ্টে চলতে লাগল। মিতার মা জীবিকার উপার্জন হিসাবে সেলাইয়ের কাজ করত। কোনো রকমে দু'মুটো ভাত ও মিতার পড়াশুনার খরচ যোগার করে দেন। এক পর্যায়ে দেখা গেল আনন্দ পাড়া সরকারি হাই স্কুল থেকে মিতা এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ পেয়েছে। মিতার স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে সে বড় ডাক্তার হবে। তাই পড়াশুনার উদ্যোগ নিয়ে সে বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হল। মিতা যখন প্রথম দিন কলেজে যায় তখন নতুন পরিবেশে এবং নতুন ক্লাসে বান্ধবীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। সেখানে অনেক বান্ধবীদের মধ্যে সে একজনকে তার মনের মতো বান্ধবী খুঁজে পায়। তার নাম লিজা। তার বড় ভাইয়ের নাম লিমন। তাদের পরিবার ছিল খুবই সুখী। মিতা আর লিজা খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। যদিও লিজা ধনী পরিবারের একমাত্র মেয়ে। লিজা মিতাকে খুব ভালবাসে। নিজের বোনের মত মনে করে। মিতা যে দিন কলেজে আসত না সেদিন লিজা মিতাদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিত। এভাবে দেখতে দেখতে কলেজে প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যখন রেজাল্ট দিল তখন মিতা ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই খুশির খবর পেয়ে লিজা মিতাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তার মা-বাবা ও বড় ভায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। হঠাৎ একদিন কলেজের স্যাররা একটি বিজ্ঞপ্তি দিল যে আগামী পহেলা বৈশাখ ১৪২০ সনে বাংলা নববর্ষ এবং বিষু উপলক্ষে তাদের কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যে যার প্রিয় বান্ধবীদের সাথে পূর্ণর্মিলন এবং গিফ্ট প্রদান করবে। সেদিন লিজা এই বিজ্ঞপ্তি পেয়ে মিতাকে বলল যে, আমি তোমাকে আগামীকাল একটি সারপ্রাইজ দিব। তুমি দেখলে খুব আশ্চর্য হবে। কিন্তু তার আগে তুমি কাল আমাকে তোমার পছন্দের সব চাইতে প্রিয় জিনিস আমাকে দিবে। এখন কলেজ থেকে ছুটি হবার পর সবাই যার-যার বাসায় চলে গেল। মিতা বাড়িতে গিয়ে তার বান্ধবী লিজার কথা মনে পড়ল এবং মিতা ভাবতে লাগল যে আগামীকাল সবাই সুন্দর পোশাক ও গিফ্ট নিয়ে কলেজে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি লিজার জন্য কি নিয়ে যাব? আর আমার তো হাতে কোনো টাকা নেই যে, আমি তার জন্য ভাল গিফ্ট নিয়ে যাব। এভাবে মিতা সারারাত চিন্তা করতে করতে

সকাল হয়ে গেল। মিতা লিজার জন্য কোন জিনিস সংগ্রহ করতে পারল না। তাই দুঃখ ভরা মন নিয়ে মিতা কলেজে রওনা দিল। তখন সবাই কলেজে উপস্থিত ছিল। লিজা ও মিতার জন্য গিফ্‌ট নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মিতা যখন রাস্তা মোড় থেকে কলেজে ঢুকার জন্য রাস্তা পার হতে লাগল তখন হঠাৎ করে একটা ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে গেল। তখন মিতার চিৎকারের শব্দ লিজার কানে পৌঁছল। তখন লিজা দৌঁড়ে এসে দেখল যে মিতা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তখন লিজা শুধু কাঁদতে লাগল এবং মিতার মাথা কোলে তুলে বলল যে, মিতা তোমার এই কি অবস্থা হল, তখন মিতা মৃদু স্বরে বলল যে, লিজা তুমি আমাকে একটি সারপ্রাইজ দেবে বলেছিলে কিন্তু আমি তোমার জন্য কিছুই এনে দিতে পারিনি বরং এই রক্ত দিয়ে আমি তোমাকে নববর্ষের উপহার দিয়ে গেলাম। এই বলে মিতা আস্তে আস্তে তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে চিরবিদায় নিল।

লেখক : ছাত্রী, একাদশ শ্রেণি, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

তুই কি বুশইত?

চন্দ্রসেন তনচংগ্যা

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারিত
নিত্য গেয়ার রক্ত ঝরের,
কি দিন আইৎসে আমা সিদি?
ভায়্য হাদত ভায়্যে মরের!

ভায়্য হাদত ভায়্যে মুলে
কাল্লোই আমি যুদ্ধ গুরির?
কি শমন-সে মনত বুনি
কাল্লায় আমি এদক মুরির?

কা শমনান ভাঙির আমি?
কা আঐৎসে দিত্তে পুরায়?
কি আর পালং কাত্তুন আমি
নিজরে মারি গুরিনে বড়াই?

বাম্মা মরা ওই যের আমি,
বোইন্নয়া ওই যার রানি মেলা;
ধন নায়া ওই, জন মরা ওই
সংসারত আমি কুধিয়র চেলা?

মুএত্তেনি গুরির অবর অবর,
গুত্তুরুন কি পাত্তা দিদন?
আমা দদ্দবা দিহিনে তারায়
চুখ জ্বলাইনে কথা কুইদন।

উসায় আলে গুত্তুরুন ভাই
ধায় মুরিদে বানা আমি;
বীরচেলাউন কুধি যান সক্কে?
মরণ-দে হাসি গুত্তুরুনি!

শান্তি তয়ের শান্তি কুধি?
য়েনে কি আমি শান্তি পাবং?
নিজ' খাইচ্চদে নিজে মুরির,
য়েনে কি আমি পুরুং উবং?

*রানি মেলা = বিধবা। * অবর অবর = বকবকানি।
* দদ্দবা = প্রতাপ: রাজত্ব। * পুরুং = সমূলে ধ্বংসে বা বিনাশ।

লেখক : চন্দ্রসেন তনচংগ্যা, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

জীবনের প্রথমার্ধে রচিত এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তেত্রিশটি কবিতা নিয়ে বিযু/২০১৪ উপলক্ষে ইউটিএসিএফ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে আমার প্রথম তনচংগ্যা কাব্যগ্রন্থ "পাত্তুর তুরু"। সবার প্রতি পাঠের অনুরোধ রইল।

জাগি উর

- রাজেল তঞ্চঙ্গ্যা

ওবাব্-ভাইলক্, মা বোইন্ লক্
এক্কুনে দিন করা কোই,
শত শত বছ-ধোই
আচু পিচু পিত্তা-পিত্তি
চুলি আইত্স্যান আ
তিন্ন্যা কানি পিনিনহি
মোরোইত্ কুচুর্য্যা
কলাত্তু মে-রা খাই মাইত্স্যান।

ত-তা আ
আর তাগলান্ ধুইনাই
জরে পরে দুগ্কাম গোই
বংশ জাত্ রাগাইঅন্ ।

ও বাব ভাই-লক, মা-বোইন্ লক
আইত্স্যার সিদিন নাওই!
তাগল ধুইনাই দুগ্ কাম গুই
বাঁচিবাত্ ।

ছালে কী উব?
উব-নআ দিনত্ তালে তালে
চলা পুরিব।
জারছ জাত্ সুরি
আমি ওই,
আর তাগলান ন-ধোইবং
আশা লোই।
গংগোই আগ শিগিবং
পাচন্ পাচন্ নানান্ বিদ্যা শিগিনাই
ই-দুনিআত্
জার নাঙান্ রাগাইবং।

গুভীন্ ঝারত্ থালেঅ
চন্দন বাইত্ ছঅহিবং।
ইংসা-ইংসি, পিছুমা-পিছুমী
ন-গোইনই
এগত্ব ওই আগহিবং।
নয়রে চিরা ন-গোইবং
দান, শীল, বাবনা গুই
ধম্ম বাত্তি জ্বালাইবং।
ও ইয়ো, তুই আমানে
আশীব্বাত্ গুইত্
গম জাঙালান দেগাই দিত্ ।
আরি জারে বিপদ-আলে
মনত্ চিরত্ সাঅইত্ দিত।
ইয়ো-রোই!

লেখক ঃ ছাত্র, রাজস্থলী কলেজ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

বিষু

- রূপম তনচংগ্যা

বিষু তুই আমা স্ববনর,
বিষু তুই আমা আয়োজন।
বিষু তুই আমা গমপানা,
ফুল বিষু রাইত ফুল তুলি নাই।
বিন্যা উলে পোরত ফুল করতি দিবং
সংসমাজ্যা মিলি নেই,
মূল বিষু দিনা ঘরে ঘরে বেড়াবং।
দলা পিরা, মূ-পিরা আ সান্যাপিরা,
আর করক কি খাবং?
আজি রঙে গীত গায় নাই
সংসমাজ্যা লই বেড়াবং।
ন আ বসত রাইত জুন প-অত
উরানত নাসি নেই
ঘিলা খেলা, নাদিং খেলা খিলিবং
দনঅ মনত দুহত ন-নি যাবং
বিষু তুই কমত্তে আবে
আমা ম অত।

লেখক : ছাত্র,
রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

অভিমানী

- স্মরণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

স্বপ্নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
কোনো এক বাস্তবতার হাটিরে
সুশিক্ষায় বদলে দেব
পুরো সমাজ জাতিকে।
বসন্তের বিকেল বেলায়
ঝিঁ-ঝিঁ পোকার আওয়াজ
মনে হলো স্বপ্ন পুরি হবে,
প্রকৃতির অভিমানী প্রমাণ দিল
তাঁর কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই, আমার কাছে
যা-ছিল সবই মাকরসার বেড়াজাল
সাবাস! স্বপ্নের অন্যন্যা তুমি ....
সুখী হও, তোমার ফ্যাশনের লাইফে
বয়ে আনুক সমৃদ্ধির কলেজ ক্যাম্পাসে
শুধুই থাকুক তোর অপক্ক বয়স
স্মৃতির অমর হয়ে ....।
জীবনে সাত-তেরো পার হয়ে
পাশে দাঁড়াবো আপন দারিদ্র ফ্যামিলিতে
হার মানবে দারিদ্র আমার কাছে
সত্যিই তুমি যা চেয়েছ তাই হবে।

লেখক ঃ ছাত্র , রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বান্দরবান সরকারি কলেজ।

বিষু

- নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা

নতুন বছরে,
নুতন রূপে সাজিয়ে দিয়ে,
এসেছ বিষু মানুষের অন্তরে।

ভোর প্রভাতে কিশোর-কিশোরী
নানান ফুল নদীতে ভাসিয়ে
তোমায় জানায় স্বাগত।

বিষু! তোমায় পেয়ে,
জাতিগত বিভেদ ভুলে
নেচে ওঠে সকল বর্ণ-জাতি।

বিষু! তোমায় পেয়ে,
দুঃখ কষ্ট ভুলে
মানুষ করে কত আনন্দ উল্লাস।

বিষু! তোমায় পেয়ে,
শান্তির কামনায় প্যাগোডা, মন্দির
ভরে যায় মানুষের দলে দলে।

তরুন-তরুনী, যুবক-যুবতীর
পানি খেলা আর ঘিলা খেলায়
মোহরিত হয়ে ওঠে বিহার আঙ্গিনা।

লেখক : বি.এস.এস- প্রথম বর্ষ,
কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

সুখের নীড়

- সুজাতা তঞ্চঙ্গ্যা

দিগন্তরে উচ্চ ঢেউয়ের মত জোয়ারে
খুঁজে বেড়ায় একটি সুখের নীড়।
দূরন্ত নদীর ধারা যেমন করে,
বয়ে যায় সাগরের খোঁজে।
দুঃখ তো পাওয়া যায় খুব সহজে
সুখকে তো ছোঁয়া যায় না।
বাস্তবতা আর স্বপ্ন নিয়ে
বর্তমানে গুমরে কাঁদছি ভবিষ্যৎ যন্ত্রনায়।
পাহাড়ের কান্না যখন ঝর্ণা হয়ে,
নদীতে মিশে যায়।
তখন বুক ফাটা কান্নায়,
ধসে পড়ে মিশে যায়
উদার আকাশে অসংখ্য তারার মাঝে
খুঁজেছি সেই সুখের নীড়
যা এক গগণ জোসনা,
রাতের চেয়েও বেশি।

লেখক : ছাত্রী, দ্বাদশ শ্রেণী
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

আর নয় দুর্নীতি

- সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা

ত্রিভুবনে এসেছি কিছু সুখ পেতে
কিন্তু, জানিনা;
সুখ কেন আমার চোখের আড়ালে।
কি সুন্দর! এই ভুবন
যার উপমা শেষ নেই।
কিন্তু হায়, দুঃখের বিষয়
দূর্নীতিতে ভরে গেছে,
আমাদের এই বাংলাদেশ।
ধনকে চিনে সবাই
মনকে চিনে কে?
দূর্নীতি যে, একটা ভাল কাজ
গ্যারান্টি দিতে পারে কে?
অফিস-আদালতে, বাজারে-দোকানে
সবখানে যে দূর্নীতি।
এমন হলে সোনার বাংলা
টিকবে না আর বেশি দিন।
অভাবের দেশে জন্ম দেওয়া
কর্মের প্রতিফল,
তাই বলে কী এমন হবো
গুন্ডা, মাস্টান হয়ে ঘুরে বেড়াবো
এটাই কি আমাদের স্বপ্ন?
ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও।
আর নয় চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী,
করো না আর খুন-হানাহানি।
মোরা এখন নতুন পথিক,
ছাত্র সমাজ দল।
সোজা পথে পথ চলবো,
দূর্নীতিকে না বলবো,
উচ্চ কণ্ঠের জয় ধ্বনিতে,
এগিয়ে যাবো সবাই মিলে,
সবাই এসো নবীন দলে, ভেঙ্গে দেবো
দূর্নীতিকে।

লেখক : ছাত্রী, দ্বাদশ শ্রেণি
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

আহবান

- প্রিয়াংকা তঞ্চঙ্গ্যা

ওহে! নবীন কিশোর কিশোরী এসো!
আমরা আমাদের জাতিকে সাজিয়ে তুলি
এক গৌরবোজ্জল জাতিতে॥
যুগ যুগ ধরে আছি আমরা,
থেকে যাবো ভবিষ্যতে ও!
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে
ইতিহাসে আমাদের জাতির,
নাম লিখাবো স্বর্ণাক্ষরে ॥
এসো আমরা সবাই মিলিত হই,
আজকের এই বিষু দিনে॥
তঞ্চঙ্গ্যা নাম দিই আমরা,
এ পৃথিবীর বুকে।
হিংসা বিভেদ ভুলে এগিয়ে যাবো,
সম্মুখ পানে।
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে,
এসো আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হই।
আজকের এই বিষু দিনে॥
জাতিকে সুন্দর করে সাজিয়ে
তুলবো আমরা সবাই মিলে।

লেখক : ছাত্রী, দ্বাদশ শ্রেণী
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

অপেক্ষা

চিনু তনচংগ্যা

খেলার ছলে হারিয়ে ফেলেছি,
আমি তাকে।
কখনো তাকে খুঁজিয়া দেখি,
দক্ষিণা হাওয়ায়।
আবার কখনো খুঁজিয়া দেখি,
ঐ নীল আকাশে।
কিন্তু তাকে কোনো খানে,
খুঁজিয়া পায় না আমি।
এ-ই নিষ্ঠুর পৃথিবী,
কেড়ে নিয়েছিল তাকে।
যাকে হারিয়ে ফেলেছি,
অনেক দিন আগে।
এখনো আমি অপেক্ষায় আছি,
শুধু তারই জন্য।

লেখক : ছাত্রী, একাদশ শ্রেণি
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

সোনার হরিণের পথচলা

জোস্না তঞ্চঙ্গ্যা

সোনার হরিণ, সোনার হরিণ
কোথায় তুমি যাও?
এত ক্লান্তিহীনতা এত সুন্দর পথচলা
কোথায় তুমি পাও?

আমি চলি নিত্য নতুন কাজের সন্ধানে
ক্লান্ত হলে হবে কি ভাই !
সমস্ত বাধা পেরিয়ে, বুকে সাহস নিয়ে
আগমনীর গান গেয়ে চলি আমি তাই।

তোমার সাহসীকতায় বিস্ময় আমি
চলার পথে নিবে কি আমায় সঙ্গী করে?

আর দেরি নয়, এসো মোর সাথে
নব ধরাতে ফুল ফোটাবো মোরা এ এক করে।

ওগো সোনার হরিণ, ধন্য আমি তোমার পথচলায়
মোদের হাতে নিশি হবে প্রভাত বেলা।

সোনার হরিণের পথচলায়
পৃথিবীর থরে থরে করবো মোরা আলোর মেলা।

লেখক : ছাত্রী, একাদশ শ্রেণি
রাঙ্গামাটি সরকারী মহিলা কলেজ।

পহেলা বৈশাখ

নবনিতা তঞ্চঙ্গ্যা (ধনিতা)

জেগে ওঠ নবীনগন,
নবপ্রভাতে নব জাগরণে,
পুরোনো স্মৃতি সব ধুঁয়ে মুছে
জাগিয়ে তোল মন নতুন সাজে।
আছে যত কালীমা মনে
ধুঁয়ে ফেল সব গঙ্গা জলে,
সৌরভীত করে তোল মন তোমার
নানান ফুলের নানান সৌরভে।
ভাসিয়ে দাও- আছে যত অশুভ
বসন্তের বিদায়ের স্রোতে,
নতুন জীবন গড়ে তোল
আজ-নতুন দিনের
পহেলা বৈশাখে।

লেখক : ছাত্রী, প্রথম বর্ষ
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

নবীন

শ্যামলী তনচংগ্যা

জেগে উঠো হে নবীন সমাজ
রচনা করি মোরা নতুন ইতিহাস।
জাগিয়ে তুলি জাতিকে,
থাকবো না আর অন্ধকারে।
ভেঙ্গে ফেলি সমাজে যত অন্যায় অবিচার,
রাখবো না মোরা আর সমাজে কোন স্বৈরাচার।
অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসো তোমরা,
সত্যের আলোর সন্ধানে।
পাড়ি দিতে হবে বহু দূর পথ,
তাই দৃঢ় মনো বলে নিবো মোরা শপথ।
অন্যায়ের সাথে কখনো মিলাবো না হাত,
ভেঙ্গে ফেলবো মোরা অত্যাচারীর হাত।
গড়বো মোরা আদর্শ সমাজ,
এটাই মোদের নবীন সমাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আজ।

লেখক : একাদশ শ্রেণি
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

নববর্ষ

জ্যোৎস্না তঞ্চঙ্গ্যা

আমরা গ্রাম্মবাসী, গ্রাম্ম মানুষ,
থাকি রোয়াংছড়িতে।
রাস্তা হল আঁকা-বাঁকা,
নেইতো কোনো ফাঁকা।
তাইতো যুবক ছেলে-মেয়ে,
মেতে উঠে হৈ-উল্লাসে।
কি হবে আর কি হবে,
চিন্তায় পড়ে গেল গ্রাম্মবাসী।
আরো অনেক বুড়ো-বুড়ি,
নেমেছে তারাও দলবদ্ধ হয়ে।
নীল হলুদ বেগুনি অজস্র ফুলের বন্যা,
দক্ষিনা হাওয়া বাতাসে নেচেছেও তারা।
যত অভিমান যত কষ্ট যত যন্ত্রনা,
সবকিছু ভুলে গিয়ে স্বাগতম জানাই,
বাংলার শুভ নববর্ষকে।

লেখক : একাদশ শ্রেণি
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

প্রত্যাশা

শান্তি চন্দ্র ত্রিপুরা

ও ভাই সকল আদিবাসীর
সকল তরুণ দল,
আমরা সবাই মুক্তো মানিক
দেশ ও জাতীর বল।

সোনার ছেলে আমরা হবো
এই আমাদের কাজ,
মানবোনা আর কোন বাঁধা
ভাঙ্গবো ভয় ও লাজ।

হিংসা-নিন্দা বাদ দিয়ে সব
বিদ্যাকে বাসবো ভালো,
শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে
জ্বালাবো প্রদীপ আলো।

শিক্ষার আলো নিয়ে মোরা
এগিয়ে যাবো বার বার,
থাকবো না আর পিছিয়ে মোরা

করবো শপথ শতবার
হতাশ হওয়া যে জাতীকে
আমরা দেবো আশা,
নেতা বিহীন জাতি হলেও মোদের
একদিন পাবো পথের দিশা।

বুক ফুলিয়ে চলবো এবার
সামনের দিকে চেয়ে,
বাঁধা বিপদ ভাঙ্গবো সকল
শক্তি সাহস নিয়ে।

নতুন দিনের নতুন আশায়
হাসবে সবার মন,
ধন্য হবে তোমার আমার
সকল আদিবাসীদের জীবন।

লেখক : কাপ্তাই হেডম্যান পাড়া
রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

বয়স যখন বাড়তে থাকে

সুনির্মল তঞ্চঙ্গ্যা

ঝরছে কেণো চোখের জল
কাঁদছো কেন তুমি?
বয়স বাড়লে হয় নাকো
জীবন মরুভূমি।
ছেলে মেয়ে কাছে নাই
শরীরে নাই শক্তি
সব হারিয়ে চাইছো তুমি
জীবন থেকে মুক্তি।
বুঝবে ভুল ওরা সবাই
আসবে আবার ফিরে
আনন্দ সুখ তখন তোমার
চার দিক রবে ঘিরে।

লেখক : রাজস্থলী, ঘিলামুন
আমতলী পাড়া।

বিজ্ঞাপন

সুহেল তঞ্চঙ্গ্যা

জেনেছি সত্য বহু দিন মনে মনে
মুক্তির পথ মিশে গেছে জনগনে,
যেখানে লক্ষ লোকের রক্ষ হাত
সৃষ্টির মাঝে নিয়োজিত দিনরাত,
সেখানে মানুষ দৈনন্দিন কাজে
প্রাণপাত করে দুঃস্বপ্নের মাঝে,
মাটি শিকড় গেরে যারা বেঁচে আছে
অধঃমরা হয়ে পাষাণের রসে বাঁচে,
সেই-জনতার দিপ্তির মিশিল ধরে
নবযুগ আসে রক্ত দিনের ভোরে।

লেখক : ছাত্র, দশম শ্রেণি
বড়ইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়

প্রকৃত দেশপ্রেম

- সুজন তনচংগ্যা

দেশপ্রেম মানে স্বাধীনতা
দেশপ্রেম মানে
অপরের দেশপ্রেমকে আঘাত করে
দেশ দখল করা নয়।

দেশপ্রেম মানে
যারা নিজের দেশকে বড় করতে গিয়ে
অপরের দেশকে ছোট করে দেয়
তারা কখনও প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়
খাঁটি দেশপ্রেম হতে পারে না
সাম্রাজ্যের হাতের খেলার পুতুল

দেশপ্রেম মানে
প্রতিটি মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকা
দেশপ্রেম মানে
হাতে হাত রেখে মানবতার সাথে বসবাস
দেশপ্রেম মানে
থাকবেনা সেখানে জাতির ভেদাভেদ।
দেশপ্রেম মানে
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাথে ঐক্য একতা

দেশপ্রেম মানে
কোন কিছুর সমস্যা নিয়ে যুদ্ধ নয়
প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্ব বিবেক দিয়ে
সমস্যা সমাধান করা।

দেশপ্রেম মানে
গোলা-বারুদ, বোমার তৈরী নয়

দেশপ্রেম মানে
প্রতিটি মানুষের অর্ন্তনিহিত শক্তিকে
জাগিয়ে তোলা।

দেশপ্রেম মানে
সৃজনশীল কাজের দ্বারা এগিয়ে আসা

দেশপ্রেম মানে
মানুষকে মানুষের প্রতি সাহায্যের,
হাত বাড়িয়ে দেয়া।

লেখক : রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি।

সংগঠন

- সংঘমিত্রা তনচংগ্যা

এসো ভাই, এসো বোন
সবাই মিলে বন্ধুত্বের সাথে গড়ে তুলি
একটি সুন্দর সংগঠন।
দিয়ে দিই নাম তার
শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জনকল্যাণমূলক
সংগঠন॥
এখানে থাকবে না হানা-হানি, মারা-মারি
থেকে যাবে মানুষের
ভালবাসা আর মৈত্রী।
রেখে যাবো একতা
সবাই দেখাব মানবতা।
এখানে রেখে যাব এপিকিউরাস, সক্রেটিস, প্লেটো
কনফুসিয়াস, এরিস্টটলের
দশনের শিক্ষা সবাই স্বশিক্ষিত হয়ে
রেখেই যাবো কীর্তিমানের স্মরণিকা॥

লেখক : এস.এস.সি পরীক্ষার্থী
রাঙ্গামাটি।

রোয়াংছড়ি

অলনা তঞ্চঙ্গ্যা (সুখী)

রোয়াংছড়িতে জন্ম আমার
তারাসা নদীর পাশে থাকি,
রোয়াংছড়ির ছবিগুলো
মনের ভেতর আঁকি।

এইখানে সবাই সমান
নেই কোন ভয়,
তের সম্প্রদায়ের লোকেরা,
এক সাথেই রয়।

এক সাথে খেলি আর
এক সাথে পড়ি,
সবাই মিলে সুন্দর জীবন গড়ার
শপথ গ্রহণ করি।

লেখক : ছাত্রী, একাদশ শ্রেণি
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

ঝিমিত ঝিমিত

- পান্টু চাক্‌মা

ঝিমিত ঝিমিত জুনি জ্বলন
রেদো সন্ডাগত্‌,
আমা চিজি ঘুম যার ইক্কু
পোরি দুলোনত্‌।

দুলোনত্‌ পোরি চিজি ইক্কু
অলর গোরি পোরিন্যা,
কানক্কন পরে জাগি উদিবো
আহ্‌জি-রুজি গোরিন্যা।

"সোনার চিজি, রুবোর চিজি"
অলর গোরি পোরি চিজি
ঘুম যা দুলোনত্‌
ইন্দি-উন্দি রিনি ন' চেয়
চোস্‌ কাত এবারত্‌ ।
সোনার চিজি, রুবোর চিজি
অলর গোরি পোরি,
ঘুমোত্তুন জাগি উদিস্‌
আহ্‌জি -রুজি গোরি।

লেখক : ছাত্র, বি.এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (ই.ই. সংস্কৃতি)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।

তন্‌চংগ্যা গান

গাবুরী

- রূপন তন্‌চংগ্যা

জুমদ যাদ্‌তে দোল গাবুরী
কুদি গিয়ে গোই-য়।
দোল গাবুরী রে-ন
দিখিলে মনান্‌
পুরী যায় গোই-য়।
কমলে আব দোল গাবুরী
সাবার মনে হর-লই-য়।
ম-মনান যদি পেলাই-য়ং
তারে, কুদি নিলো-গোই-য়।
পু-ত-তি রাইদত মনদ্‌ ওদে
ঘুম জাই ন-পারং।
ঘুম গেলে মুই বানা
তারে শমনে দে-অং।
ও গাবুরী জাদি আয়,
তরে বাচাই-আ-হং
তুই-ন-আ-লে গাবুরী
ম-মনান, পুরী যায় গোই-য়।

লেখক : ছাত্র, বি.এস.এস, ১ম বর্ষ
রাঙামাটি সরকারি কলেজ।

ধাঁধার আসর (বানা ধয়ানা)

১। গাইত্ খাই মারি আগে্
২। জুমে জুমে ধুব ছা-অল
৩। ডুললেই ডুইত্ নডুললেই প-ঙতই
৪। চাল আহে্ তলা নাই
৫। গাছ্অ উয়ে পানি কুয়া
৬। গাছ্অ উয়ে সং-আ-জিল
৭। ডুলল্েই এক মুট্ নডুলল্েই এক বেয়ং
৮। কালাইয়া পুন্ত, রাংয়াইয়্যা লেয়াইত্
৯। চোয়া তুমত্ পুন্ সি্-তাই
১০। এক ডুবা বাইত্ গুনি নপুয়্যাই
১১। মুই থাং গাইসিয়ত্ আগাত্ তুই থাইত্ পানিত্ ভিরে দেগ্যা-উব-তলগে।
১২। কানি কানি তোগ্যাই পেলে ননিসাইত্
১৩। খেলেয় এক্কা নখেলে্য় এক্কা
১৪। দুলল্ে দুই পাই্ চেলে-নদেগে
১৫। আইস্যো পের ভিরে মাছি গুসন্

উঃ- ১। ওইপুক, ২। কুমা, ৩। বেশেগ্যা, ৪। ছারি, ৫। ডাব, ৬। কংচা, ৭। জাল, ৮। আগুইন, পেলা, ৯। ধুপ, ১০। চুল, ১১। মরোইত, মাইত। ১২। জাঙাল, ১৩। শামুক, ১৪। কান, ১৫। ঘ-ভিরে-মানুইত্ ।

সংগ্রহেঃ- দিপা তঞ্চঙ্গ্যা, সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা, সাধনা তঞ্চঙ্গ্যা, কাঞ্চনা তঞ্চঙ্গ্যা, জলপুরী তঞ্চঙ্গ্যা, রিতা তঞ্চঙ্গ্যা, প্রিয়াংকা তঞ্চঙ্গ্যা, চিংম্রাথুই মার্মা।
দ্বাদশ শ্রেণী, বান্দরবান সরকারী মহিলা কলেজ।

উড়ু চিঠি

- রাজ মিত্র তঞ্চঙ্গ্যা

প্রিয় প্রমি,

এই উড়ু চিঠিটা লিখতে অনেকগুলো কাগজ ছিড়েছি। কিন্তু কিছুই লিখতে পারিনি। ক্ষত বুকের ভেতরে জমে থাকা হাজারো অভিমান নিয়ে যতটুকু পারলাম তাই তোমার কাছে পাঠালাম।

১৩/০২/২০১৪ইং তোমার শুভ জন্মদিন। তুমি কাছে নেই, তাই সামান্য উপহারটুকুও কেনা হয়নি। ১৪/০২/২০১৪ইং বিশ্ব ভালবাসা দিবস। গভীর রাত জেগে অনেকগুলো এসএমএস লিখেছি। কিন্তু একটাও পাঠাইনি। সবগুলো ডিলেট করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আর কোনো দিন গান লিখবো না, সুর ও করবোনা। তবুও মনের অজান্তে অনেকগুলো কথা সুরহীনা গানে রূপ নিয়েছে ডায়রির পাতায়।

তাই এই উড়ু চিঠিটা লিখলাম তোমার উদ্দেশ্যে, 'উড়ু চিঠি' নামটা আমি কল্পনায় রেখেছি। বাস্তবে এর কোন মূল্য নেই। আজকাল আমি কল্পনা করতে বেশি ভালবাসি। এজন্যে হয়তো এই কল্পনা বিলাসীতা। যাহোক, গত ০৬/০৯/২০১১ইং মঙ্গলবার আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিলে। চিঠিটা পেয়েছিলাম ৩১/০৫/২০১৩ইং তোমার একান্ত ডায়রীতে। আজ কেন জানি মনে হলো, সেই চিঠিটা আবার তোমার কাছে ফেরত পাঠাই। তাই পাঠিয়ে দিলাম। তুমি চিঠিতে লিখেছিলে-

ডিয়ার ভাইয়া,

কেমন আছো? জানি আমার জন্য খুব মন খারাপ তাই না? জানো ভাইয়া আমার ও না খুব মন খারাপ। আর আমার যখন মন খারাপ হয় তখন আমি এই ডায়রিতে লিখতে বসি। তুমি তো এখন অনেক দূরে তাই আমার মনের সব দুঃখের কথাগুলো কাউকে বলতে পারিনা। তোমার মতো করে কেউ তো আর আমার অবুঝ পাগলামি মেনে নিতে পারবেনা। তোমার মতো করে কেউ আমাকে হাসাবে না, ভুলাবেনা আর আমার দুঃখের অংশীদার হবেনা। তুমি কতো ভালো ভাইয়া।

তুমি তো আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভাইয়া। জানিনা ভাইয়া আমাকে নিয়ে তোমার যত স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবো কিনা। আমারও অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন দেখি ভাইয়া শুধু তোমার স্নেহের ভালোবাসায় আর অশেষ উদ্দিপনার কারণে।

জানি না ভাইয়া আমার জীবনে আমি কতদূর সামনে এগুতে পারবো। তবুও স্বপ্ন দেখি অনেক বড় হওয়ার। স্বপ্ন দেখা তো কোনো দোষের ব্যাপার না। জানি না আমার এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পূরণ হবে কিনা। আমি শুধু সেদিনটির আশাই বসে আছি যে দিনটিতে আমি আমার প্রিয় ভাইয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো "ভাইয়া তুমি আমার কাছে যে আশা করেছিলে আজ আমি তা পূরণ করেছি। আজ আমি অন্য দশটা মানুষের

মতো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।" আর সেদিন তুমি আমাকে নিয়ে খুব গর্ব করবে তাইনা? তখন খুব মজা হবে তাইনা ভাইয়া। আমি আজীবন সে দিনটির আশাই থাকবো। আর শুনো ভাইয়া যখন ডায়রিতে আমার এই লেখাটা পড়বে তুমি কিন্তু একদম হাসবেনা বুঝেছ?

ভাইয়া কখন তুমি আসবে?
তোমায় না আমি খুব মিস্ করছি।
তোমার মতো করে তো কেউ আমাকে
ভালোবাসেনা, বুঝতে চেষ্টা করে না।

আচ্ছা, তুমি কি এখনো আমায় আগের মতোই খোঁজ প্রমি?

সেদিন কি হলো তোমার? সবাই বলছে তুমি নাকি নিজের গায়ে আগুন দিলে! কিন্তু আমি আজো তা বিশ্বাস করতে পারিনি। তুমি তো জানোই, তোমাকে ছাড়া আমি একটা মুহূর্তে থাকতে পারিনা। আমাকে ছাড়া তুমিও তো থাকতে পারো না। তবে কেন এমন হলো? জানো প্রমি, এই উড়ু চিঠিটা কখনো নীলাকাশে ভেসে তোমার কাছে পৌছবেনা। কারণ, মা-বাবা আর তোর ভাইয়ার প্রতিদিনকার নীরবে কান্নার জলে ভিজে এই চিঠিটা খুব ভারি হয়ে গেছে। ভগবান! অজান্তে কি এমন পাপ করলাম? কেন আমার আদরের বোনটাকে অকালে মৃত্যু কেড়ে নিলো?

জানো প্রমি, তোমার কোমল দেহটা যখন অগ্নির দহনে জ্বলছে গিয়ে ছিলো তুমি তখন মৃত্যুর যন্ত্রনায় কাটরাচ্ছিলে। আর অসহায়ের মতো তোর ভাইয়া প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, নিঃশ্ব হাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলো- ভগবান! আমার জীবনের বিনিময়ে একমাত্র বোনটার জীবন ভিক্ষা দাও।

আজ যদিও তুমি অন্য প্রান্তে! তবুও কি, কৃষ্ণ দা, মিলিন্দ প্রসাদ, অখিলাল, সঞ্জিৎ, আনন্দ, কিশোর, সুনীল (যে নিজের রক্ত দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো) শিমুল, ক্ষেমা, হিরো, তুফান, মুন্নি, সুজাতা, অনুপমা, সবুজ, আশীষ দা, বিমল দা, নিরুপম, রক্সি, পিংকি, রানু, জোস্না, প্রমিলা, সঞ্চিতা, সুমন, রত্না, রোমা, জেনিকা, শ্যামলী, মধুমিতাসহ স্মৃতির পাতায় জড়ানো আরো অনেক অনেক বন্ধু-বান্ধবী এবং যাঁরা স্বদেশ ও বিদেশ থেকে আর্থিক আর মনোবল যোগায়- সেই মহৎ প্রাণগুলোর কথাও কি ভুলে গেছো? আমরা যে তাঁদের কাছে চিরঋণী।

আমার দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে তুমি কি থেমে গেছো? "সব বাঁধা উপেক্ষা করে সামনে চলার প্রেরনা আজীবন যোগিয়েছি। তাই দূর সীমান্তে দাঁড়িয়ে আজও বলছি- যেখানে যাও-সেখানেই থাকো ...... নিজের পথ চলা থেমোনা..... ।"

হয়তো আবার দেখা হবে সেই পথের মাঝখানে। সেখানে তিল তিল করে সাজানো সব স্বপ্নগুলো পূরণ হবে সীমাহীন আনন্দে। তখন দু'জনার মাঝখানে থাকবে না কোনো দূরত্ব।

প্রিয়,
পাঠক, পাঠিকা,

উড়ু চিঠির শেষ প্রান্তে সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ পৃথিবীর সকল আদরের বোনগুলো যেন আমার একমাত্র আদরের বোনটার মত না হয়। তাঁরা যেন সকল বিপত্তির মাঝেও নিজের পরিবার থেকে অকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। কারণ, যে পরিবার এত আদর স্নেহ, মায়া-মমতায় জড়ানো ভালবাসা দিয়ে বড় করেছে- সে পরিবারকে এত বড় আঘাত সহ্য করার মতো নয়।

ইতি,
তোর মেজ ভাইয়া।

লেখক : তিনকোনিয়া, বিলাইছড়ি উপজেলা।